আশাবরী

আশাবরী

অরুণ বাগচী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
মুদ্রক
বংশীধর সিংহ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

আলাপ
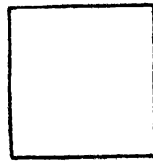
আমি গাইয়ে। আমি শিল্পী। আমি কখনো এভাবে মরতে পারি না।

মাথার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের মত চলে গেল কথাগুলো। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। পঞ্চান্ন বছরের বিশ্বস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো হঠাৎ বিদ্রোহ করেছে। কোনো নির্দেশ মানছে না। শুধু কপালের দুপাশে দপ্ দপ্ করছে শিরা। আর মস্তিষ্কের অন্ধ অন্তরঙ্গ কোষে অনুকোষে ছুটোছুটি করছে টুকরো ভাবনাগুলি। তাও যেন ক্রমেই তারে তারে জড়িয়ে আসছে। হারমোনিয়মের উপর দ্রুত আঙ্গুল চলছিল যেন সাবীর খাঁর। একটা কিছু শমে আসতে চাইছিল। ঝালার ঝলমলে পূর্ণিমায়। কিন্তু না, এলোমেলো হয়ে আসছে। একটা সঙ্গীতহীন শব্দরিক্ত শূন্যতা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে সব কিছু। মাটির উপর পড়ে গেল টগর। আঘাত লাগল শরীরে। টগরের কিচ্ছু হল না।

মনে ভয়ানক উদ্বেগ আর বিরক্তি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল টগর। মার দেওয়া ডাক নামে ডাকবার লোক ক্রমেই কমে গেছে। এখন সবাই বলে খাঁ সাব। গুরুজী। ওস্তাদজী। শুনে গুবগুবিয়ে পেটের তলা থেকে হাসি উঠে আসে টগরের। শালা কত বড় উস্তাদ আমি, কত মেকদার, এই সব বুদ্ধুগুলো না জানুক, আমি তো জানি। উস্তাদ হওয়া অত সোজা নয়। এ-যুগ কটা আস্লি উস্তাদ দেখেছে? দুই। কি আড়াই। বড় জোর তিন। ভাবীকাল কজনকে দেখবে? মাই-খাওয়া বয়সেই যত মিঞা সব উস্তাদ সেজে বসে গেছে। লজ্জাও করে না, ব্যাটাদের! আর বলিহারি যাই শ্রোতাদের পাগলামি দেখে। এই সব ঝুটা পাথর নিয়েই মশগুল। শুনত যদি চাচাজীর জোয়ান বয়সের গান। তাঁর সেই--

ব্রেক কষে সামলে নেয় নিজেকে টগর। লোককে দোষ দিয়ে আর কী হবে? লোক শুনবার সুযোগ পায় কতটুকু? চাচা বুরহান্উদ্দিন সামনে বসে গান শুনিয়েছেন যাদের, তাদের মধ্যে কজন আজও কবরের বাইরে? হ্যাঁ, আছেন পাথরোঘাটার ঘোষবাবু, ভবানীপুরের রসিকলাল বানারজিবাবু, লাখনাউয়ের নবাবজাদা মীর খাঁ সাব। আঙ্গুলে গোনা যায়। তা-ও ঘিলু কজনার আজ শক্ত আছে কে জানে। তিনি নিজে, সারাজীবন ধরে চাচাজী বুরহান্উদ্দিন খাঁ

সাহেবের মত স্বরে গাইবার চেষ্টা করে আসছেন। হয়েছে কি? হয়নি। কোথায় সেই তেজ, সেই তাবিশ, সেই মিঠাস? কোথায় কোয়েল, আর কোথায় কৌয়া!

তাইতেই কত হাততালি। কত ফুলের মালা। ছপ্পর ফুঁড়ে টাকা এসেছে। সরকারী ইনাম মিলেছে দু-দুবার। রাষ্ট্রপতিজী নিজের হাতে কুর্তার উপর মেডেল সেঁটে দিয়েছেন। খেতাব দিয়েছেন। কাবুল সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বাদশা জহীর শাকে যথাবিহিত সম্মান জানাবার সঙ্গে সঙ্গে গিরিজীর হাঁটু ছুঁয়ে আদাব জানিয়েছে টগর। হাজার হলেও আমি ভারতী। তুমিই আমার আমীর, আমার শাহান শা।

কাবুলে সেই রাত। কত মজা, কত জলুষ। আমীর বললেন, তুমি তো অমুকের ভাতিজা। কানে হাত দেয় টগর। তাঁর কথা কেন ওঠে? আমি কিছু না। আমি একেবারে কিছু না। আমি তিনি হেঁটে চলে যাবার পর পড়ে থাকা রাস্তার ধুলি। আমাকে জুতো মেরে হিন্দুকুশ পার করে দিন। এই সব মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে গান ধরে টগর। ঝকঝকে আলোর মালা ......ফুল......আতরের ভারী খুশবু......চিকের আড়ালে সুন্দরীদের উপস্থিতি......তবলিয়া বাবর মিঞার লাল দাড়ি......সামনে দুজন রাজপুরুষ ......দেখে মনে হচ্ছে আমীর এখুনি ঘুমিয়ে পড়বেন। হঠাৎ তাঁর মাথা নড়ল, মুখে অস্ফুট 'সাবাশ', আশ্চর্য, সব ছাপিয়ে কানে এল। ভিক্ষুক মন। মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানাল টগর। তারপর, আস্তে আস্তে সব মুছে গেল। কিছুই কোথাও রইল না। শুধু দপদপিয়ে তারা জ্বলা মস্ত আকাশ। আর আমি গাইয়ে টগর।

সেই রাতে, সেই আসরে, তার নিজেরও মনে হয়েছিল, আজকের গান চাচাজীর দোয়া পেয়েছে। শ্রোতাদের সাধুবাদে নয়, তার নিজের মনেই একটা তৃপ্তি জেগেছিল। দুর্লভ এক তৃপ্তি। মদ খাবার আগেই ঈষৎ মত্ততা পেয়ে বসেছিল তাকে। খানাপিনা শেষ হতে কত রাত হয়েছিল হিসাব ছিল না। কেমন করে নিজের শোবার ঘরে ফিরে গিয়েছিল, মনে নেই। চটকা ভাঙতে দেখে বিছানার পাশে বসে, ঠিক যেন মেহবুবা। কেবল বয়েস তার কুড়ি বছর কমে গেছে।

কী তার নাম কোনোদিন জানা হল না। হয়তো বা বাজারের আওরাৎ। নইলে অত ছলাকলা শিখেছে কোথা? শরীরের ব্যাপারে তার কাছে মেহবুবা ঘাস। জোয়ানী বয়সেও মেহবুবার শরীর বাঁধা যন্ত্রের মত টনটনিয়ে উঠতে পারেনি। আর ওই মেয়েটা? যার সঙ্গে একটা কথার আদানপ্রদানও হয়নি। শুধু দেহ নিয়ে খেলা। খেলা? না, লড়াই বলাই ভাল। এবং সে লড়াই ফতে করা হয়নি টগরের। ক্লান্ত বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে, নরম বুক আঁকড়ে টগর ভাবল অন্তত থ্রি-টু-ওয়ানে আমি হেরে গেলাম। ছেলে

বিভাসের উজ্জ্বল মুখ একমুহূর্তের জন্য মনে পড়ল। বাবা, আমি বড় হয়ে মহমেডান টিমে খেলব।

কাবুল থেকে দেশে ফিরেও কিন্তু এক মাস ঘরে ফেরা হয়নি। প্রোগ্রাম ছিল বোমবাই, দিল্লি, আমেদাবাদ, আবার বোমবাই, মাইশোর। সেখান থেকে কলকাতা আসবার প্রস্তাব বাতিল করতে হল মীর খাঁ সাব মরনাপন্ন খবর পেয়ে। লাখনাউ যেতে হল টগরকে। অন্দরমহলে শাঁখের কাজ করা পালঙ্কে অজ্ঞান নবাব সাহেবকে দেখে চোখ ফেটে জল আসছিল। আপনিও চললেন, নবাব সাব? দুনিয়া যে আর একটু আঁধার হয়ে যাবে। এরপর থেকে গোলাপ আর এত লাল মনে হবে না। তাঁর প্রিয় ফুল গোলাপ। যৌবনকালে রাগ করে একটা তোড়া ছুঁড়ে মেরেছিলেন বেগম সাহেবার পরিচারিকাকে। বেটপুকো কাঁটা লেগে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল তার। অনুতপ্ত মীর খাঁ সাহেব তাকে বিয়ে করে নিলেন। তাই নিয়ে মহলে অশান্তি। নীচু ঘর জুবেদার। কেউ তার সঙ্গে উঠবস করতে রাজী নয়। অথচ খুদার কি খেলা। তিন তিনটে বেগম নবাব সাবকে একটা ছেলে দিতে পারেনি। চারদিকে কিচ কিচ করে বেড়াচ্ছে মেয়ের দঙ্গল। জুবেদা একবার আঁতুড়ে গেল তোর বিয়োলো যকজ ছেলে। ছেলেদের নিয়ে মেতে গেলেন নবাব সাব। কিন্তু তার একচোখের জল নিয়ে ক্রমেই আড়ালে চলে গেল জুবেদা। স্বামীর শয্যার অংশ আর তার কপালে জোটেনি। ছেলেরাও খোঁজ রাখেনি কানী মার। প্রাসাদের এক টেরেয় ভাঙ্গা মসজিদ আর মাজার। তারই পরিচর্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল জুবেদার দিনরাত্রি। বেচারী জুবেদা। তার ট্র্যাজেডির শেষ অংক তখনও বাকি।

টগরের চোখে জল। কিন্তু জুবেদার জন্য নয়। হয়তো নবাব সাহেবের জন্যও নয়। চাচাজীর জন্য। মীর খাঁ সাব গোরে গেলে চাচাজীর সঙ্গে দুনিয়ার সম্পর্ক আরো কমে যাবে। আর একটু গরীব হয়ে যাবে টগরের স্মৃতি। তিনি যখন মারা যান টগর তখন মাত্র সতের বছরের কিশোর। বোমবাই শহরে চাচাজীর ফ্ল্যাটে বসে ঠেলে রেওয়াজ মারছে। চাচাজী গেছেন পাটনার কাছে কোন্ রাজামহারাজার আমন্ত্রণে। লাহোর করাচী সেরে ফিরবেন। কলকাত্তা যাবেন একবারও বলেননি। কিন্তু টগর জানত, পাটনাতক্ পৌঁছে চাচাজী কখনও স্থির থাকতে পারবেন না। একবার কলকাত্তা যাবেনই। গহরকে দেখতে যাবেন। গহরজান। যাকে না হলে রইস বাবুদের মাইফেল জমে না। চাচাজীকে গহর গুরু মেনেছে, কিন্তু দিল দিতে পারেনি। পারেনি, কিন্তু অমন মুষকো জোয়ান মানুষটার হৃদয় কাচের বাসনের মত আছাড় মেরে লাখো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছে। রাত্রে নেশায় জারানো ঘুমের মধ্যে গহরের নাম ধরে ডেকে ওঠেন উস্তাদ। তন্দ্রাহীন রাতে পায়ের শব্দ শোনা যায় ঘরের এধার থেকে ওধার, একটানা, অবিরাম। ওই শব্দের পিছনে অনুচ্চারিত নাম একটাই। রাঁচী

গিয়ে হিমেল রাত্রে পৃথিবী-ডোবানো জোৎস্নার মধ্যে একটা ফতুয়া চাপিয়ে বসে আছেন বুরহানউদ্দিন। সুদূরে দৃষ্টি। কী দেখছেন তিনি। কিছুই না। বুকের মধ্যে রক্ত পড়ছে টপ টপ ফোঁটায়। গহর, গহর।

তা, রেওয়াজ চালাচ্ছে টগর। চাচাজীর ভাষায়, চেল্লাচ্ছে। 'আগে তোর আওয়াজ ছিল ভঁইসের মত। এখন কৌয়া বরাবর। কে বলে মাটিকাটা মজদুর নয়া তাজমহল বানাতে পারে না? মেহনতে সব হয়! এমন সময় বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। জনাকয়েক মোটাসোটা লোককে যথারীতি সঙ্গে নিয়ে হাঁসফাঁস করে উপরে উঠে এলেন পরশুরামজী। কোটিপতি বানিয়া। চাচাজীর বড় পেট্রন। দরাজ দিল পরশুরাম। খাতিরযত্ন করে বসালো টগর। ভুঁড়িটা তাঁর শরীরে সব চেয়ে আলগা ব্যাপার। সেটাকে সামলে বসতে হয়, উঠতে হয়। দম ফিরে পেতে পরশুরামজীর সময় লাগে সাড়ে তিন মিনিট। চাচাজীর হিসেব। ওর মধ্যে কুত্তামার্কা একটা রেকর্ড পুরো বেজে যায়। বড় শ্বাস ফেলে পরশুরামজী বললেন, বেটা, এসব কী শুনছি? উস্তাদকে নাকি গুণ করে মেরে ফেলেছে গহরজান?

মোরাদাবাদে গিয়ে পেঁছিল যখন টগর, চাচাজী তখন মাটি পেয়েছেন। চারদিক থেকে রিস্তেদাররা এসে জুটেছে। তাদের আদ্দেককে জীবনে কখনও চোখে দেখেনি টগর। যত শকুন জুটেছে মরা মাংসের লোভে। নবাব সাহেব বললেন, রাগ করে। ওই দঙ্গলে একমাত্র নবাব সাব সত্যিকার আপন। আর সব আওরঙ্গজেবের চেলা-চেলি। একদিন চত্বরে বসে এলোমেলো চিন্তা করতে করতে কখন কোন্ ভাবের ঘোরে গান ধরে দিয়েছে টগর। মৃদু গুণগুনানি কখন জোরালো সুরেলা হয়ে উঠেছে খেয়ালও ছিল না তার। চমক ভাঙ্গতে দেখে সামনে বৃদ্ধ নানাজাতীয় কেউ (এসেছেন পেশোয়ার থেকে) আর হাজী মকবুলার রহমান। হাজী সাহেব মাথা নাড়ছেন। আর টকটকে ফর্সা মুখ রাগে জ্বলে যাচ্ছে, নানাজী সরু চেরা গলায় তিরস্কার করে যাচ্ছেন। শোকের মধ্যে গান? না-পাক্ কী এ সমস্ত? চাচাজী যতদিন ছিলেন কখনও খবরদারি সইতে হয়নি টগরকে। চোখ উপচে জল এসে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে এসে দাঁড়ালেন মীর খাঁ সাব। তাঁর সহজাত আভিজাত্য মুহূর্তে পরিবেশ বদলে দিল। কত মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন নবাবজাদা। কিন্তু মনে হল চাচাজীর আওয়াজের মতই তা আর সব শব্দ মুছে দিয়ে উড়ল।

"আপনারা জ্ঞানীগুণী মানুষ। কুরান, হাদীশ, এ সব নিয়ে তর্ক করা আমার পক্ষে বেওকুফি। কিন্তু টগর তো বাচ্চা। ও কী বোঝে? জবান ফুটতে না ফুটতে উস্তাদ ওকে সা-তে গলা ফেলতে শিখিয়েছে। দুনিয়ার আর কী ও জানে? তাছাড়া খুদার বান্দা আপনারা, কিছুই আপনাদের অজানা নয়, বলুন তো উস্তাদজী জীবনভর কোন জিনিস পেয়ার করে এসেছেন? গান—ঔর

ক্যা! কিয়ামতের দিন তক্ উনি মাটির নীচে শুয়ে শুয়ে কী শুনতে ভালবাসবেন? ওই টগর যা ওকে শোনাচ্ছে! আর যদি বলেন, মিঞা বুরহানউদ্দিন নিজেই বা কত কানুন মানত যে এসব শেখাবে? তবে আমি একটা আরজ করি। আল্লার দোয়ায় এত বড় খানদান আপনাদের। কত দৌলত এক এক জনের। এক এক জনা কত লিখাপড়া জানা। কিন্তু তামাম হিন্দুস্থান কুর্নিশ করে কাকে? একমাত্র ওই বুরহানউদ্দিনকে। বেটা টগর, আ জা মেরে সাথ।"

মীর খাঁ সাব বলেছিলেন টগরকে চাচাজীর মৃত্যুকাহিনী। পাটনা থেকে তিনি টগরের আন্দাজমত কলকাতা যাওয়াই ঠিক করেছিলেন। মহিষাদলের রাজবাড়ি থেকে আমন্ত্রণও এসেছিল। কিন্তু পাটনাতেই কে তাকে খবর দেয় গহরজান কলকাতা ছেড়ে মনের দুঃখে বানারস চলে গেছে, আর ফিরবে না। ব্যস, উস্তাদ চললেন কাশীধাম। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা ঢুঁড়েও গহরের ঘাঘরার প্রান্তরটুকুর পর্যন্ত দেখা মিলল না। হতাশ হয়ে গঙ্গাজীর তীরে বসে আছেন। সিদ্ধি-মালাইয়ের নেশা ঝিমঝিমিয়ে মগজ জুড়ে নাচ শুরু করেছে এমন সময় সারেঙ্গীবাদক গজানন মিশির এসে হাজির। নানারকম তকল্লুফির পর তিনি আসল কথা ভাঙ্গলেন। হলদোয়ানির কাছেই চম্পক সিং রাঠোড় আছেন। আমীর আদমি যাকে বলে। এবং কদরদান খুব। উনি চান উস্তাদের গান শুনতে। প্রচুর খাতির করবেন রাঠোরজী। আর ভাল টাকাও ছাড়বেন। গজাননেরও অমন কমাসের খোরাক জুটে যাবে।

এক কথায় না করে দিতে যাচ্ছিলেন। মিশির তাড়াতাড়ি বলে উঠল: তাছাড়া ভূতের ব্যাপারটাও আছে।

ভূত? কী ব্যাপার? উস্তাদজী নড়েচড়ে বসলেন। ওই এক বিরাট দুর্বলতা তাঁর। ভূতে যত ভয়, তত আসক্তি। ভূতুড়ে বাড়ি শুনলেই তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হবেন রাতবিরেতে। অবশ্য এক আধজন সংগীসাথী নিয়ে। আগেকার দিনে বড় বড় গাওইয়ারা সব গান গেয়ে ভূত নামাতেন। আড়ানা এবং মালকোষ গেয়ে কালে খাঁ সাহেবের গুরু ফতে আলি খাঁ সাহেব মৃত বুজরুগ্দে জড় করতে পারতেন। অথচ আমি, তামাম হিন্দুস্তানের মশহুর গাবাইয়া বুরহানউদ্দিন, আজ পর্যন্ত কিছু ঘটাতে পারিনি। নিদেন একটা ভূতের উপর গান পরখ করে দেখা যেতে পারে। তাই উস্তাদ সাপখোপ চোট্টা ডাকুর তোয়াক্কা না রেখে ঘাটে আঘাটে হিন্দুদের শ্মশান কেরেশ্চানের মুসলমানের গোরস্থান কঁহা কঁহা মুলুক চলে যান। এক তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে তিব্বত যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। খচ্চরের পিঠে চাপতে হবে জেনে শেষ পর্যন্ত সেটা বাতিল করে দেন। ওতে অবশ্য নবাব সাহেবের কারসাজি ছিল। তিনি উস্তাদকে বোঝালেন তাঁর ওজন খচ্চর বইতে পারবে না। মাটির ওপর বসে পড়বে। পাহাড়ের উপর উঠে যদি এই কাণ্ড হয় তখন কী হবে? উস্তাদ তবু নিরস্ত

হন না। দোনামনা করেন। তখন রজব আলির গাধা (গাধা আর খচ্চরে খুব আর কী তফাৎ, নবাবজাদা বোঝালেন) ধরে আনা হল। সে গাধা তোফা ট্রেন্ড। যেই উস্তাদজী চড়বার আয়োজন করেন সে অমনি গাঁক গাঁক চিৎকার জুড়ে দেয়। নয়তো ধুপ করে বসে যায়। খুব দমে গেলেন উস্তাদজী। তবু থেকে থেকেই তিব্বত তিব্বত করেন। গানের মুজরো আসে এখান থেকে ওখান থেকে। নেন না। হঠাৎ কলকাতার মল্লিকবাবুরা লোক পাঠালেন। তার সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে ট্রেনে গিয়ে চাপলেন উস্তাদ। গহরের আকর্ষণে তিব্বত আর তান্ত্রিক চাপা পড়ে গেল।

তা মিশিরের কথায় নিশিতে পাওয়া মানুষের মত উস্তাদজী চললেন হলদোয়ানি। সেখানে একরাত মাইফেল জমিয়েই মিশিরকে বললেন—চলো, চলো। দের কিঁউ? মোরাদাবাদে চাচেরা ভাইয়ের বাড়িতে সদাসর্বদা এসে ওঠেন। এবার চুপিচুপি রাত কাটালেন একটা মুসাফিরখানায়। তারপর সকাল হতে না হতে এক্কা চেপে রওনা দিলেন আট মাইল দূরের নির্জন পরিত্যক্ত পি ডবলু ডি-র রেস্টহাউসের দিকে। চারদিকে ঝোপ জঙ্গল। সামনে মাঠ, পিছনে মাঠ। বাংলোটা পরিষ্কার ঝরিষ্কার এমনিতে। দারোয়ান সকালের দিকে ঘন্টাখানেকের জন্য আসে। গেটটাও খোলে না। বাইরে পাথরের ওপর বসে খইনি ডলে। বিড়ি ফোঁকে। তারপর কেটে পড়ে। মাসান্তে ছয় টাকা তলব ঝুকতে যায় মোরাদাবাদ সদর দফতরে।

বাংলোর দরজা টানা ছিল। খুলে ঢুকলেন দুজনে ভিতরে। মিশির প্রথম থেকেই সরে পড়ার তালে ছিল। হলদোয়ানির গ্রোগ্রামে উস্তাদকে রাজী করানোর তাগিদে টোপ ফেলেছিল। এখন বঁড়শী আটকে গেছে নিজের গলাতেই। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কাঠ। ভূতে আর আকর্ষণ নেই। কিন্তু সে-কথা কবুল করার সাহসও নেই। উস্তাদ যদি একবার সিংহ-গর্জন করে ওঠেন তার অন্ডদ্রব হয়ে যাবে। শালার শালা ভূতেও অতটা ভীতিপ্রদ হতে পারে না।

একপাশে একটা ঘর, ও পাশে আরেকটা। নেয়ারের খাটপাতা। মাঝখানে বড়সড় হলঘর। কাপড় দিয়ে মুছেটুছে উস্তাদকে বসতে দিল ইজিচেয়ারে। বসা মানে শোওয়া। শোওয়া মানে ঘুম। নাক সরব হয়ে উঠল মুহূর্তে। পাশের ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল মিশির। বাপরে কী নাকের ডাক। এক নাকে সওয়াল, অন্যটায় জবাব।

বিকেলে সঙ্গে আনা খাবার শেষ করে জাজিমের উপর বসে গান জুড়লেন উস্তাদ। প্রথমটা জমতে চায় না, জমতে চায় না। সময় গড়িয়ে যায়। এ রাগের পালা সাঙ্গ করে পরবর্তী রাগে চলে যান বুরহানউদ্দিন। লতা বেয়ে পাতায়। তারপর একসময় গায়কের অজান্তেই গান জমে গেল। বিকেলের শেষ আলোটুকু শুষে নিয়ে শক্তিধর হয়ে সতেজ কান্ড নেমে গেল মাটিতে। শিকড়ের সূক্ষ্ম

সৌন্দর্যে। নিবিড় ধরনীস্নেহে। আকাশ অসীম। আলোহাওয়ার আশীর্বাদ অনন্ত। মাটির গভীরতা তুচ্ছ ক্ষুদ্র মানুষকে কোন্ বিরাট রহস্যের মুখোমুখি করে দেয়। ধুকপুক করছে পাখি-মানুষের অকিঞ্চিৎকর হৃদয়। বিশ্বের অধি-দেবতা, কোথায় তুমি রইলে। ভালবাসা পেতে পেতে আয়ু যে ফুরিয়ে আসে। মাফ করে দাও সব অক্ষমতা। আমার হাত তারানক্ষত্র ছুঁতে পারে না। ভাগ্যে কণ্ঠে গান দিয়েছিলে। তাই আমাদের কান্না, আমাদের ক্ষমাভিক্ষা, আমাদের পুজা—প্রার্থনা।

লাখনাউ থেকে তার পাঠিয়ে পুলিশ নিয়ে এল নবাব সাহেবকে। মিশির এমনিতেই দুর্বলচিত্ত। তায় কড়া ধমক আর কঠিন হাতে চড়চাপড় খেয়ে থরথরিয়ে আছে। আত্মীয় বলতে নবাব মীর খাঁ সাহেবের নাম করে দিয়েছে। কোতোয়ালি পৌঁছে ধীরে ধীরে সব বিবরণ শুনলেন তিনি। দুতিনরকম এজাহার দিয়েছে মিশির। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে কে বলবে। তাকে ছাড়ানো যাবে পরে। সর্বাগ্রে কর্তব্য মজলিশের হাত থেকে লাশ তোলা। ডাক্তাররা কেটেকুটে যা ফেরৎ দিয়েছে! মাটির ঘরে মাটির উপর চটে জড়ানো দেহটা দেখে সব আভিজাত্য ভুলে শিশুর মত কেঁদে ফেললেন মীর খাঁ। অত বড় মানুষটা। কে জানে মিঞা তানসেন তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন কি না। কেমন শুয়ে আছেন দেখ পিঁপড়ে-লাগা বে-ওয়ারিশ লাশ হয়ে। দু-টাকা খরচা করে গোর দিয়ে দেবে মজলিশ। যেন ভিক্ষুক একটা, সারা জীবন ধরে লালন করা পরনির্ভরতা মৃত্যুর পরও ভুলে যায়নি যেন।

যা করার মীর খাঁ সাব্ই করলেন। লোক পাঠালেন বোমবাই, টগরকে আনতে। রিস্তেদারদের সন্দেশা ভেজতে হল। সূক্ষ্ম ঈর্ষা ছিল পরশুরামজী সম্বন্ধে। তাঁকে খবর পাঠালেন দেরী করে। পরশুরামজী এলেন না। কিন্তু দিল্লি বড়লাটের দফতরের সঙ্গে তুরন্ত যোগাযোগ করলেন। ফলে মাটি দেবার দিন বিরাট জনতার মধ্যে দেখা গেল দুটো লালমুখ। ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সুপার মহামান্য লাটসাহেবের পক্ষ থেকে ফুল নিয়ে। তাঁর বার্তাও পড়া হল। ট্রিবিউটস টু এ গ্রেট সন অব ব্রিটিশ ইনডিয়া অ্যানড এ লয়াল সাবজেক্ট টু হিজ ম্যাজেসটি কিং জরজ ফাইভ অব ব্রিটেন। টগর এসে বাঁধানো বয়ানটা দেখল বসবার ঘরের দেয়ালে। টগরের কাছেই ওটা বরাবর ছিল। লাহোর রায়টের সময় বাড়িঘরদোরের সঙ্গে ওটাও পুড়ে যায়। টগর তখন কোথায়? চট্টগ্রামে। কদিন বাদে চলে এল কলকাতা। অবশ্য আস্তানা বলতে তখন বোমবাই আর ভূপাল। কলকাতাবাস আরও পরের ঘটনা।

মিশিরের যে গল্পটা মীর সাহেব মোটামুটি সত্যি বলে মেনে নিয়েছিলেন তা হল এই। উস্তাদের গান মুহূর্তে জমে গেল জয়জয়ন্তীতে এসে।

গীতগোবিন্দের দুটি ভাঙা লাইনের উপর দিয়ে দারুণ দক্ষ গলা চলেছে উস্তাদের। পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শংকিতভবদুযানম্। রচয়তি শয়নম শংকিত নয়নম পশ্যতি তব পন্থানম। ঋষভ পঞ্চমে সুর কায়েম করা অপূর্ব সেই কারিগরী। মুহূর্তে মুহূর্তে আবিষ্ট হচ্ছে মন। শিহরিত হচ্ছে সর্বদেহ। চরসের নেশা ঘাম হয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে পরিশ্রমের ঠেলায়। খাঁ সাহেবের গানের নেশায় মজে গেছে মিশির। চোখ বন্ধ। সব দারুণ জমজমাট। হঠাৎ মিষ্টি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে খরখরিয়ে ঘড়ির স্প্রিং কেটে গেল। অদ্ভুত চেরা গলায় উস্তাদ বলে উঠলেন ইয়া আল্লা, বহ্ ক্যা হ্যয়? চমকে চোখ মারতেই নজরে এল উস্তাদের ভয়ার্ত মুখচ্ছবি। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কী দেখে অমন ভয় পেল উস্তাদ? ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল মিশির। কিন্তু দপ করে ডিজ বাতি গেল নিভে। একজোড়া সবল সাঁড়াশী-হাত মিশিরকে মাটি থেকে তুলে ফেলল উপরে। ঝড়াং করে সারেঙ্গী গড়িয়ে গেল। দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল কেউ মিশিরকে। ভাঙা বাঁ হাত নিয়ে রাতবিরেতে খানাখন্দ পেরিয়ে কেমন করে কোতোয়ালি পোঁছল মিশির সে এক কাহিনী। পরদিন ভোরে পুলিশ গিয়ে দেখে উস্তাদ তেমনি বসে। প্রণামের ভঙ্গীতে সামনে ঝুঁকে পড়ে শক্ত হয়ে গেছে শরীরটা। পাশে তানপুরা পড়ে। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। শুধু জিভ নেমে এসেছে অনেকটা। যেন কেউ গলা টিপে ধরেছিল। ডাক্তার এমবাম করে নরম হওয়া শরীরটাকে টেবিলে শুইয়ে ফালাফালা করে বিজ্ঞ রায় দিলেন। রোগী সম্ভবত দারুণ আতঙ্কে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে মারা গেছে। উস্তাদ গোরে যাবার পর সবাই পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন যে তাঁর কোনো ফোটো নেই। সারা হিন্দুস্থান ঘুরেছেন তিনি। কেউ তাঁকে ক্যামেরার কাছে নিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর ধারণা ছিল ছবি তোলালেই ঝপ করে মরে যাবেন। এ যুগের সেরা গাইয়ে. তাঁর সুরত কেমন ছিল ভাবীকাল তা জানবে না।

মীর খাঁ সাহেবের অবশ্য গাদা গাদা ছবি। তিনি চলে গেলে সবার কাছেই চেহারার আদল থেকে যাবে। টগর ভাবলে।

কিন্তু তিনি মরলেন না। একটা অঙ্গ একেবারে পড়ে গেছে। নিজের চেষ্টায় বিছানায় উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না। জ্ঞান হবার পর, বিপদ-সীমানা পেরিয়ে আসার পর, টগর একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বিদায় চাইল। আস্তে আস্তে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে। মীর খাঁ সাহেব বললেন, হাঁ বেটা জরুর। ঘর আছে। জরু বালবাচ্চা আছে। তাছাড়া, এইতো তোমার চলবার সময়। বসে থাকলে তো অন্যায় হবে।

কিন্তু বিদায় দেবার সময় চোখে তাঁর জল। তোকে আটকাই. বেটা আমার সে শক্তি কোথায়? শের আওড়ালেনঃ

রুস্তমসে পুছিয়ে বহ্ তাকৎ কাঁহা গয়ী।
ফুলোঁকী সেজ্‌পর জিস্ নাজনীনোকো নিদ না আতী থী,
উস্ নাজনীনোঁসে পুছিয়ে বহ নাজাকৎ কাঁহা গয়ী।
আজ্‌নবীকো কোৎল কিয়া জিস গড়ুরসে বহু হুকুমৎ কাঁহা গয়ী?
বনী থী রঙ্গ মহ্‌ফিল নও শেরোয়াঁ কী উঁচী ইমারৎ পর,
টাঙ্গী থী লাখো ফানুস, গুঁনজতী থী শেহ্‌নাই, বজতী থী যমকী ডংকা।
সব কবরমে গয়ে। আজ হুঁ ভি নহি, হাঁ ভি নহি।

রুস্তমকে জিজ্ঞেস করুন, অত যে শক্তি সব গেল কোথায়? ফুলের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসত না যে সব কোমলাঙ্গীদের, তাদের জিজ্ঞেস করুন তো, ওই পেলবতা কোথায় গেল? যে শান্ত্রী সরকারী হুকুম তামিল করতে গিয়ে ভিনদেশী আগন্তুকদের মুণ্ডু কাটত, সেই শান্ত্রীকে প্রশ্ন করুন, ওই সরকার গেল কোথায়? বাদশা নও শেরোয়াঁর সুসজ্জিত প্রাসাদে কত বড় মাইফিল বসেছে, কত হাসিগান উচ্চারিত হয়েছে, কত ফানুস উড়েছে, শানাই গুঞ্জন করেছে, যমডংকা বেজেছে। কোথায় গেল সব? সব কবরে গেছে। আজ আর কোথাও সাড়াশব্দটুকুও নেই।

গাড়ি থেকে নামল টগর। যেন এক যুগ পরে বাড়ি ফেরা। মেহবুবাকে দেখে ভারী খুশী টগরেব মন। দুহাতে বুকের মধ্যে টানতে যাবে, বাধা দিল মেহবুবা। ভাবল টগর, হয়তো ছেলেপিলেরা কেউ এসে পড়বে ভেবে সংকোচ করছে সে। কিন্তু না। পাশের ঘর থেকে পাউলি হাতে এল মহবুবা। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে জল ছিটিয়ে দিল গায়ে। ডাইনী। ডাইনী তোমার ছুঁয়েছে। আমার গায়ে হাত দিওনা।

ঠাস করে চড় পড়ল যেন টগরের গালে। কী জটিল মেয়েদের মনস্তত্ত্ব! কাবুলের সেই মেয়েটা, সত্যিই কি ডাইনী? কিন্তু বুঝল কী করে মেহবুবা? কেউ তাকে বলে দিয়েছে? অসম্ভব। কিন্তু সত্যি তার মনে হল কলজেটা যেন ফাঁপা হয়ে গেছে। মীর খাঁ সাহেবের প্রাসাদেও কদিন টগর স্বস্তি পাচ্ছিল না। সেকথা তার মনে হল। শরীরটাকে কি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল বাজারের সেই আওরাৎ। মৌলালির দরগায় যাওয়া ভীষণ বাড়িয়ে দিল মেহবুবা। ঘন ঘন বাড়িতে আসতে লাগলেন পীর সুলেমান। তার লম্বা লম্বা লেকচার সহ দুহাত তুলে দয়াভিক্ষা ভিতরে ভিতরে পীড়া দিতে লাগল টগরকে। থেকে থেকেই মন বিদ্রোহ করতে লাগল তার। কিন্তু উপায় কী?

এমন সময় ছোট মেয়ে সুমন এসে ঝপ্ করে বলে বসল, বাবা আমি আবুকে বিয়ে করব। বহুদিন বাদে সে রাতে মেহবুবা এসে এক বিছানায় শুল। ওগো কী হবে? আবু অর্থাৎ আবদুল পাড়ার সবচেয়ে বড়লোক

ব্যবসায়ী লতিফ সাহেবের ছেলে, একমাত্র সন্তান। এসব পরিবারে যা একান্ত দুর্লভ। ফ্যামিলি প্ল্যানিং কর্তারা জানতে পেরে উল্লসিত হয়ে লতিফ সাহেবের শরণ নেন। এইসব সমাজে তাঁদের আন্দোলন আদৌ দাগ কাটছে না। এইতো সামনের বিরাট বস্তীটা। যত প্রকট দারিদ্র্য, ততটাই আন্ডাবাচ্চার ঝাঁক। পরিকল্পনার ভলান্টিয়ারদের পাত্তাই দিতে চায়না কেউ। লতিফ সাহেব যদি একটু মদত দেন, ইত্যাদি।

লতিফ সাহেব ঠান্ডামাথার লোক। ব্যবসায়ী মানুষকে রাগলে চলে না। কিন্তু ওকথা শুনে দারুণ রেগে গেলেন হঠাৎ। একরকম গেট আউট করে দিলেন তাদের।

ঝট করে জবাব দিতে পারে না টগর। সত্যিই তো কী হবে? মেহবুবা, আবুর মা ফিরোজা, আর টগর। একটা ভয়ংকর গোপন কথা আগুনের ধুনির মত জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে বসে আছে। তিনজনে। আর খানিকটা আন্দাজ করতে পারেন লতিফ সাহেব। পাপপুণ্যের হিসেব রাখা দুরূহ ব্যাপার। সে চেষ্টা টগর কোনোদিন করেওনি। আবুকে মেহবুবা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। টগরই বরং তাকে এড়াতে চায়। সুদর্শন কান্তিমান ছেলে আবদুল। চেনাজানা আদ্দেক মেয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সুমন সে দলে পড়বে মেহবুবা টগর কখনও ভাবেনি। অথচ কেন ভাবেনি? সুমন বা আবু, কেউ তো সত্যিকথাটা জানেনা! ওদের কী দোষ?

ক্লান্ত মেহবুবা ঘুমিয়ে পড়ল। টগরের চোখ ঘুমে জড়াতে চাইলোনা। অতীত তার মস্ত ছায়াটা ফেলে টগরের জীবনে ঝড় আনতে চাইছে। সুমন মা বাবার নীরবতাকে সম্মতি ভেবে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেছে। তার স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করে তো বলা যায় না, সুমন, তুই আবুকে অত কাছে কাছে পেতে চাসনা। আবু তোর আপন ভাই। এ বিয়ে আল্লাতালা মানবেন না।

সব দোষ মেহবুবার। তার প্রাণের মিতা ফিরোজার দুঃখে মেহবুবা গলে গিয়েছিল। হিতাহিত জ্ঞান ছিলনা তার! নইলে যত বড় বন্ধুই হোক, আপন স্বামীকে কেউ তার হাতে তুলে দিতে পারে? পর পর তিন রাত। লতিফ সাহেব গেছেন ইয়োরোপ। প্রায়ই তাঁকে দেশের বাইরে যেতে হয়। কখনো কখনো নিঃসন্তান ফিরোজা এসে সহেলীর বাড়িতে রাত কাটায়। কখনও বা মেহবুবা গিয়ে শোয় তার কাছে। বিশেষত মুজরো নিয়ে টগর যখন কলকাতার বাইরে যায়।

সেবার ফিরোজা এসে আছে এ বাড়িতে। তার আগে কদিন তর্কাতর্কি গেছে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে। একটা বাচ্চার অভাবে সাহারা হয়ে আছে ফিরোজার জীবন। লতিফ সাহেবের অত বিষয় সম্পত্তি কে খাবে? ওই বিচ্ছেবজ্জাৎ ভাইপোভাগ্নেগুলো যারা চোদ্দ না পেরুতে বস্তীতে গিয়ে ছেলেপুলে বানাতে

লেগে গেছে? সাহেব ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছেন লতিফ সাহেব। তাঁর ঔরসে কারও সন্তান হতে পারে না। ফিরোজা খোঁটা খায় সব বৃদ্ধ, আত্মীয়াদের কাছে, যদিও সে নির্দোষ। শেষপর্যন্ত একটা নফর বাবুর্চি নিয়ে ফিরোজা দোরে খিল দেবে? সেটা কি ঠিক হবে? টগর পুরুন্ত পুরুষ মানুষ। দশটা মেহবুবাকে দিয়ে থুয়ে তার অনেক বাকি থাকে। একটু করুণা করুক না মেহবুবার প্রাণসখীকে। তৃষ্ণা জল শুকনো লতার নিভৃতে পৌঁছাক।

শেষ পর্যন্ত টগরের ধারণা ছিল মেহবুবা ঠাট্টা করছে। হয়তো বা তাকে পরীক্ষাও। ভেবেছিল লাজুক ফিরোজা কিছুতেই আসবেনা। কিন্তু ভুল ভেঙেগ গেল যখন মেহবুবা একরকম ঠেলেই তাকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিল। দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে আস্তে আস্তে ফিরোজা এসে খাটের পাশে দাঁড়াল। নতুন বিবি যেন। চেনা ফিরোজা অচেনার সাজে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। চোখে সুন্দর করে সুরমা টানা, যেমনটি টগর পছন্দ করে। ফিকে নীল শাড়ি, কপালে টিপ (জীবনে এই প্রথম টিপ পরেছে ফিরোজা), হাস্নুহানার ছড় নেমেছে চুল থেকে কাঁধে। সব, সব, ঠিক যেমন টগরের পছন্দ। মেহবুবার কিচ্ছু ভুল হয়নি। ফিরোজা অস্ফুটস্বরে বলে, জানি ভাইসাব, আপনার মত নেই। সব মেহবুবার পাগলামি। কিন্তু আমাকে দয়া করুন। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

প্রথম রাতের কথা ভাবতে টগর কষ্ট পায়। কিছুতেই নিজেকে তৈরী করতে পারেনি সে। অসীম ধৈর্যের সঙেগ ফিরোজা তাকে সহ্য করেছে। সবটাই একটা মস্ত গ্লানির ব্যাপার। বোধহয় আর আমি কোনো মেয়েকে। টগর ভেবেছে। বোধহয় পারবনা আর ফুরিয়ে গেছি। বোধ হয় ফিরোজা ঠাট্টা। সকালে হাসবে। কী করে মেহবুবা তুই। একটা বেকার লিঙ্গধারীকে কেন। যে কিছু করতে পারেনা। আমার অমন সুন্দর শ্বেত পাথরের উরতের গায়ে নোংরা ছিটিয়ে। ওয়াক থুঃ।

পরের রাতে ভেবেছিল ফিরোজা আর আসবেই না। কিন্তু এসেছিল। এবং তার পরদিনও। পরম স্নেহে চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। টেনে নিয়েছিল বুকের উপর। স্বস্তিতে, কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল টগর। শেষরাতে উঠে যাবার সময় অনেক অনেকক্ষণ তাকে আঁকড়ে ধরে, ছিল ফিরোজা। আপনারা বড় ভাল ভাইসাব। আমি আপনার, মেহবুবার, বাঁদী হবারও হক রাখিনা। মাফ করে দেবেন।

চতুর্থ রাত্রে এল মেহবুবা। কী, হতাশ হলে তো?

তারপর ধরা গলায় বললে, আজ আমাকে নাও। যেমন করে ফিরোজাকে নিয়েছে। ও বলে তোর মিঞাটা ডাকাত। আমার শরীরের সব কলকব্জা ভেতরে ভেতরে ওলট পালট করে দিয়েছে। হ্যাঁগো আমাকে আর ভাল লাগবে তো?

আমি তো ফিরোজার নখের যুগ্যি নই। ওর বুক আমার চেয়ে অনেক ভাল, তাই না?

এরও মাসকয় পরে বলেছিল, মিঠাই খাওয়াও। সুখবর আছে। তিনটে মাসিক বাদ গেছে ফিরোজার। তুমি সত্যিই মরদ।

এখন কে কাকে মিঠাই খাওয়ায়! সুমন এ কোন্ সমস্যার জাল বুনে মাঝখানে মেয়ে মাকড়সার মত দোল খাচ্ছে?

পিঠাপিঠি জুবেদার কথা মনে পড়ে যায়। বেচারী জুবেদা। দুঃখ যে পায় তাকে জীবনভর দুঃখ পেয়েই যেতে হয়। কী বিচিত্র বিচার দুনিয়ার। জুবেদার কথা ভাবলে মনে হয় একটা নিষ্করুণ বীতহরিৎ রুক্ষতার গায়ে আমরা আমাদের সব ইমোশনের ফেণা, ঢেউ নিয়ে আছড়ে পড়ছি তো পড়ছিই। পাথরের কোনো ইমোশন নেই।

মাজারের পরিচর্যায় দিন কাটাচ্ছিল জুবেদা। নবাব সাহেবের পুরোনো মনজিলের শেষপ্রান্তে চত্বর আর বিরাট পুকুর। চারপাশের ঝোপঝাড় এগুতে এগুতে বাধা না পেয়ে ঝুপসি জঙ্গল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাঙা মসজিদের লাগোয়া গোটা তিনেক কুঠরি নিয়ে জুবেদা বাস করে। রসুইখানা থেকে বাবুর্চি খানসামারা চার বেলা খাবার দিয়ে যায়। যেটুকু ইচ্ছা খায় জুবেদা। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কেউ তার সঙ্গে বলতে সাহস পায় না। একঝাঁক পাখি পায়রা কাক চড়ুই খাবারের ভাগ নিতে আসে। আসে কুকুরের দঙ্গল। বেড়াল বুনো শেয়াল। প্রধান বাবুর্চি নুর আলি বলে হাড় চিবুতে দুটো নেকড়েও নাকি মাঝে মাঝে আসে।

মসজিদের সামনে বাঁধানো বেঞ্চে বসে বসে জুবেদা আকাশ জঙ্গল জল দেখে। এঁটো খাওয়া প্রাণীদের দেখে। দেখে, ধড়ফড় বুক নিয়ে, জীবজগতের প্রণয়লীলা। আড়শালা, পাখি, বুনো সাপের জড়াজড়ি। পাল খাওয়া।

একদিন আবছা চাঁদনী রাতে ঘাট থেকে উঠে আসছে। মসজিদের অন্যপাশ থেকে একটা যেন গোঙানির আওয়াজ। নজর চালিয়ে জুবেদা বুঝল একজোড়া মানুষ শরীর নিয়ে খেলছে। তা খেলুক। দিনের আলো নিভলে আকাশে তারা উঠবেই। বাতাস যা গন্ধ পাবে, ভাল কটু যে কোনো গন্ধ, তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দেবেই। প্রকৃতি যা যা করাবার ঠিক ঠিক করিয়ে যান।

হঠাৎ জুবেদা চমকে যায়। না। ব্যাপারটা তো ঠিক তা নয়। এরা সব ঘুলিয়ে দিচ্ছে। কীটপতঙ্গ পশুর মত স্বাভাবিক দেওয়া নেওয়া নয়। অসহায় কাউকে কামড়ে খিমচে ফালাফালা করে দিচ্ছে কেউ। ছোবল মারছে ঘন ঘন। বিষ ছিটিয়ে দিচ্ছে।

পুরোনো মর্চেধরা একটা তরোয়াল কে জানে কী ভাবে জুবেদার কাছে এসেছিল। সেটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে জুবেদা এগিয়ে গেল।

বার-তের বছরের বাচ্চা একটা নোকরানীকে মাটিতে ফেলে তার উপর চেপে বসেছে লম্বাচুল লোকটা। মেয়েটার কাঁচুলি ঘাঘরা টেনে ছিঁড়ে আলুথালু শানের উপর ফেলে দেওয়া হয়েছে। খুব ছুঁড়েছিল বোধ হয় কচি পা। সেদুটো গুণ্ডাকৃতি একটা লোক সজোরে ধরে রেখেছে। আর একটা লোক তার ডান হাত আটকে রেখেছে। বাঁ-হাত দিয়ে মেয়েটা খিমচে ধরে আছে আক্রমণকারীর পিঠ।

লম্বা চুলভরা মাথাটা লক্ষ্য করেই কোপ মেরেছিল জুবেদা। পিছলে গিয়ে ডান কাঁধের উপর বসে গেল তরোয়াল। আর্তনাদ করে গড়িয়ে গেল লোকটা। লোকটা নয় ছেলেটা। জুবেদারই ছেলে। যমজ দুটোর একটা। কোনটা জুবেদাও বলতে পারবে না। বাঁ দিকে পাছার কাছে ছোট তিল দেখে ছোটবেলা ফারাক করা যেত দুজনকে। যদি বাঁচে, তবে আর তাকে চিনতে এবার আর কারুরই অসুবিধে হবে না। জুবেদার তরোয়াল পাকা কাজ করে দিয়েছে।

সব ঝামেলা যখন চুকলো দেখা গেল ছেলেটার ডান হাত নেই। জুবেদা পাগলা গারদে। কোনোদিন আর বেরুবে না। মীর খাঁ সাহেবের চুল আদ্দেক শাদা হয়ে গেছে।

সেবার মহা অশান্তিতে পড়ে গিয়েছিল টগর। টোকিও-তে মাইলড হার্ট অ্যাটাক হল একটা। হাসপাতালে কদিন থাকতে হল। প্রথমটা ভয় খেয়ে গিয়েছিল। যদি আর গাইতে না পারে। কিন্তু বড় বড় ডাক্তাররা সব আশ্বাস দিলেন। সে রকম কিছু নয়। নর্মাল লাইফ লিড করতে পারেন। তবে হাজার হলেও বয়স তো হচ্ছে। বাড়াবাড়ি—কোনো কিছুতেই—বিপজ্জনক হতে পারে। চল্লিশের পর মদ, সবরকম নেশা ইনক্লুডিং স্মোকিং অ্যানড উইমেন—হাঃ হাঃ—সব মেজারড হওয়া ভাল।

ছাপাখানার সবকটা 'ল' ব্যবহার করে জাপানী ডাক্তার তার ইংরাজি বয়ান বাঁধিয়ে এনে টগরের টেবিলে রাখলেন যেন। এক ঘণ্টা বাদে তাঁর দফতর থেকে 'উইথ কমপ্লিমেনটস টু অ্যান ইনডিয়ান সিংগার' ফলের সাজি এল একটা। কী সুন্দর সাজানো। যেন ফুজিয়ামার ল্যানডস্কেপের সামনে মরশুমী ফুলের গুচ্ছ।

কিন্তু টগর অসুখ নিয়ে চিন্তিত ছিল না। তখনও না। ভিতরে ভিতরে সে খুব সুস্থ বোধ করছিল। হাসপাতালের নিয়মে থেকে, পুষ্টিকর ভেজাল-হীন মশলাবর্জিত খাবার খেয়ে, তার ভেতরটা যেন সাফ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এত নিশ্চিন্ত একাকিত্ব কতদিন ভোগ করতে পারেনি টগর।

তার সমস্যা অন্যত্র। দিনে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেই ওই এক স্বপ্ন। বীণ হাতে নিয়ে সরস্বতী বসে আছেন। মাথার পিছনে আলো। পায়ের কাছে ধবধবে শাদা ফুল, ফুটফুটে রাজহাঁস একটা। স্বপ্ন যখন দেখে, কী আনন্দ।

জেগে গেলেই অস্বস্তি, অপরাধ বোধ। পীর সাহেব শুনলে চটে যাবেন। ছেলের নাম বিভাস রাখাতে আপত্তি করেছিলেন। ওতো কাফেরের নাম। টগর বলেছিল, না, বিভাস রাগের নাম। যেমন হিন্দুর সম্পত্তি, তেমনি মুসলমানের। সেই বিভাস আবার বারোয়ারী পুজোর চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। পড়বি পড় পীর সাহেবের সামনেই। খুব বকুনি খেল মেহবুবা। টগর কিন্তু নামটা কিছুতেই পালটাতে রাজি হল না। রাগ করে পীরসাব কনেকদিন কথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি ক্ষমা ঘোষণা করলে সে খবর হাসিমুখে বয়ে নিয়ে এসেছিল মেহবুবা। টগর ভালমন্দ কিছুই বলেনি। কিন্তু মাঝে মাঝেই তার মনে হয়েছে, এই যে বিভাস কিছুতেই গানবাজনা করতে সম্মত হল না, হল চারটারড অ্যাকাউনটেনট, ওটাও বোধ হয় পীর সাহেবের প্রতিশোধ নেওয়া।

স্বপ্নের ব্যাপারটা আলাদা। স্বপ্ন তো টগরের মনে। তবু টগর অস্বস্তিতে ভোগে। তারপক্ষে এই ধরণের স্বপ্ন দেখা কি ঠিক? হাজার হলেও হিন্দুদের দেবী বলে কথা—

'তোমার চাচাজীর চাঁদিতে সরস্সোতি মাঈ-র পায়ের ছাপ আঁকা ছিল।'

চমকে গেল টগর। ধানবাদে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছিল দলটা। এক কামরায় বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের সঙ্গে টগর আর দু চারজন অন্য ভদ্রলোক বসে। ট্রেনও ছাড়ল। বড়ে খাঁও গলা ছাড়লেন। ওই ঝমঝম আওয়াজ চতুর্দিকে। পরোয়াই নেই তাঁর। গাড়ি স্পিড বাড়ায় কমায়, উনিও লয়ের হেরফের ঘটান। রেল ব্রীজের উপর গাড়ি উঠেছে, লাইন বদলাচ্ছে ইনজিন, স্টেশন ঢুকছে—বড়ে খাঁ সাহেব গলা ঘোরাচ্ছেন, ওঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন। কিছুটা ছেলেমানুষি। অনেকখানি জবরদস্ত উস্তাদি। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল সবাই। টগরও। ভাবছিল, অত সঙ্গীতপ্রাণ না হলে কি এতবড় গাবাইয়া হতে পারতেন? চাচাজীর চিন্তা মাথায় এসে গেল। কোথায় শুয়ে আছেন তিনি ঠান্ডা, ভেজা মাটির নীচে। কতদূরে চলে এসেছে টগর।

হঠাৎ গান থামিয়ে, তার দিকে সরাসরি চেয়ে বড় খাঁ সাহেব বললেন: তোমার চাচাজীর চাঁদিতে সরসসোতি মাঈ-র পায়ের ছাপ আঁকা ছিল। তাই অত উঁচুতে উঠেছিলেন তিনি!

তারপর সলজ্জ হেসে বললেন: 'আমার চাঁদিতেও আছে। এসে দ্যাখ।' কেশবিরল মাথাটা নুইয়ে দিলেন সবার দৃষ্টির সামনে।

ঝপ করে টগর বলে ফেলল: গোস্তাকি মাফ করবেন উস্তাদজী। আপনি তো মুসলমান। ধর্মপ্রাণ সাচ্চা মুসলমান! আপনি এইসব সরস্বতী-টরস্বতী মানেন কি করে?

খুব জোরে হেসে উঠলেন গোলাম আলি। শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন।

চোখের কোণায় জল এসে গিয়েছিল। মুছে নিয়ে বললেন: "হাসলাম বলে কিছু মনে কোরো না বেটা। সরসসোতি, সরসসোতি। শংকর হলেন শংকর মহাদেও। এর মধ্যে হিন্দু মুসলিম কিচ্ছু নেই। হিন্দুরা কি আমাদের চেয়ে জিয়াদা উঁচা, আচ্ছা, কিছু প্রাণী যে, সরসসোতি শংকরজী সব ওদেরই হবে। কাবা শুধু আমাদের? যে লোক কাবার দিকে মুখ রেখে আল্লাতাল্লাকে খেয়াল করে, কাবা তার-ই। তোমার চাচাজী এটা জানতেন। একবার এক মৌলা তাকে খুব ডেঁটে দিল। কী, না, মুসলমান হয়ে নমাজ পড়না রোজ! উস্তাদ বুরহানউদ্দিন—খুদা তাঁকে দয়ার দরবারে হামেশা কায়েম রাখুন—কী উত্তর দিলেন? 'রাগ করবেন না মৌলাজী। আমি যে হরবখত গান গাইছি। কখনো গলায়, কখনো মনে। তাতেই তো নমাজ পড়া হয়ে যাচ্ছে।' এতবড় কথা যে কেউ বলতে পারত না। পারতেন তিনি! আবদুল করিম খাঁর কথা ধ্যান কর। তিনি তো নমাজ পড়ার আগে সরসসোতির মন্ত্র বলতেন কী একটা!

"আমি যখন গান করি, কোনো রাগে দেখি নদীর পারে প্রদীপ জ্বলা মন্দির। কোনো রাগে দূরে সন্ধ্যা-মাখা অস্পষ্ট মসজিদের মিনার। আজান শুনলে আমার চোখে জল আসে। আবার গাঁয়ের আওরৎরা একটানা গান গাইতে গাইতে নদীতে প্রদীপ ভাসাতে যায়। আমার কলজে টুকরো হয়ে যায়। তা আমি কী করব? খুদার সঙ্গে লড়াই করতে যাব এ নিয়ে? যে খুদা তাঁর অমন দয়া আমার উপর রেখেছেন? আমাকে মুসলমান ঘরে পাঠিয়েছেন?

"জান, আমি একটা খোয়াব দেখি মাঝে মাঝে। নদীর ধারে শংকর মহাদেও বসে তানপুরা নিয়ে গান গাইছেন। সামনে দিয়ে ঢেউ চলে যাচ্ছে। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। অথচ সমস্ত মুখটা হাসিতে গম গম করছে। ওই নদীটা বইছে, ওটাই সব। গান থেমে গেলেই ওটা থেমে যাবে। আর ঢেউ উঠবে না। কিয়ামতের দিন এসে যাবে।"

অশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বড় ছেলে বিভাস পুব দিকের তিনটে ঘর নিয়ে থাকে। গানবাজনার যে ধারা বাড়িতে নিত্য-প্রবাহিত, তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজের অফিসে মক্কেল দোস্তদের নিয়ে। তার বিছানার পাশে কোনো কোনো রাতে চুপিচুপি রেকর্ড বাজে। চুরি করে গান শুনিয়ে যান মারিয়া কালাস, আমালিয়া রোদরিগাস, মিরিয়ম মাকেবা। বাজনা শোনান অয়েস্ত্রাখ বাপব্যাটা, হাইফেৎজ। কখনো আঁচমকা চেঁচিয়ে ওঠেন কিশোর কুমার, রফি, লতা, আশা। ঝপ করে তাদের মুখ কেউ চেপে ধরে। কেউ না, বিভাস নিজে। তার আশংকা, বাবা চটে যাবেন। টগর ম্লান হাসে। উজবুক একটা। তবে কোন্ ছেলেই বা তার বাবাকে পুরো বোঝে? টগরের ওদিকটা পরিষ্কার। বাবা মারা যান টগর পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই। সে তখন

মায়ের দেহের গভীরে স্নেহরসের সমুদ্রে ভাসছে। জ্ঞান হবার পর দেখেছে মা তাকে তেমন ভালবাসেন না। টগর যেন তাঁর স্বামীকে হারানোর মূলে। পাঁচ বছরের টগর, অপরাধী অসহায় অনাদৃত টগরকে পরিপূর্ণ আপনার করে নিয়ে নিলেন চাচাজী। নইলে কী হত টগরের? কবে ভেসে যেত!

বাড়ির ব্যাপারে থাকে না বিভাস। কিন্তু বড় আদরের সুমন। তার শুকনো মুখ। বিভাস মাকে বলে ফেলল। কেন তোমরা আপত্তি করছ? আবুর মত ভাল ছেলে আমার তো নজরে আসে না। তাছাড়া সুমন যখন চায়! সুমন শংখের সঙ্গে সিনেমা যেত। তাতে পীরসাহেবের আপত্তি। বার বার সুমনের ইচ্ছাতে তোমরা বাধা দেবে?

মেহবুবা চোখে আঁচল চাপা দেয়। বিভাস পালিয়ে যায় অফিস ঘরে। কিন্তু কাগজপত্রে আর মন দিতে পারে না!

গানের ঘরে গান জমে না। সুমন কোন ভোরে উঠে এসে যন্ত্রপাতি মুছেটুছে তানপুরা নিয়ে বসে যায়। অনেক পরে চোখ মুছতে মুছতে আসে ন-বছরের পরোজ। পীরসাহেব যার নাম রেখেছেন মহম্মদ রেজা। বাঁশির মত রিনরিনে আওয়াজ পরোজের। বয়সা ধরলে গলা কেমন দাঁড়াবে কে জানে। টগরের ভরসা ভালই হবে। ধরানার ইজ্জৎ রাখতে পারবে পরোজ। কী গলা ছিল বিভাসের। অনেকদিন পর্যন্ত টগর ভাবত, চাচাজী ফিরে এসেছেন। সেই বিভাস হঠাৎ পাহাড়ী বক্‌রীর মত গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে গেল। আমি পড়ব। গান শিখব না। দুটো একসঙ্গে হয় না। কথাটা আসলে টগরই বলেছিল। কিন্তু যে অর্থে সেই দিকে হাঁটলো না বিভাস। অমন গলা নিয়ে, বুরহানউদ্দিনের নাতি হয়ে গেল টাকা-পয়সার হিসাব রাখা শিখতে!

পরিবারের নিয়ম ভেঙ্গে সুমনকে গানে বসিয়ে দিল টগর। তালিম দিতে লাগল। উস্তাদের ঘরে সবাইকে, যারা গানের ঘরে বসে, একাধিক বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। টগর নিজে খেয়ালিয়া। কিন্তু বেশ ভাল তবলা বাজাতে পারে। পারে সারেঙ্গী এবং সেতার সুরবাহার বাজাতে। এলোমেলো জানা নয়। দরকার হলে দশজনের সামনে পেশ করার মত জ্ঞান। অনেক রাতে যখন টগর গায়, ঘরে কেউ থাকে না, সুমন ঠেকা রাখে। পরোজ বসে থাকে। তারপর ঢোলে। তারপর শুয়ে পড়ে তাকিয়া জড়িয়ে। মেহবুবা এসে তুলে নিয়ে যায়। টগর বলে, সারা রাত ওর কানে গান থাকবে।

ওই রাতের তালিমই আসল তালিম, ঘরের তালিম। সারাদিনের খোলা তালিম সবার জন্য। যে যতটা পার নাও। রাত্রিবেলা আমার ঘরানার জিনিষ, বাপ পিতামহ কত পুরুষের সব খুন-পাসিনা এক করা বিদ্যা, আমি তুলে দেব যোগ্য উত্তরাধিকারীকে। তাকে আর কী দিতে পারি? কত অর্থই বা দিয়ে যেতে পারি? দিতে পারি কঠোর সাধনা, কঠিন পরিশ্রম আর বিপুল

অনিশ্চয়তার উত্তরাধিকার। কিন্তু দিয়ে যেতে হবে ওই ঘরানার যথার্থ সম্পদ, বাদশার খাজানচি যে মণি-মাণিক্য-হীরা জহরতের খোঁজ রাখে না। আর খুদাতাল্লাহ যদি তেমন ভাগ্যই করেন, যদি নাতিপুতিরা কেউ না-লায়েক হয়, তবে ভরিয়ে দাও উপযুক্ত শাগীরদের দুহাত। ফতে আলি খাঁ যেমন দিয়েছিলেন কালে খাঁ-কে।

পরোজ তো শিশু। সুমনের উপর কতখানি নির্ভর করেছিল টগর। বুকের মধ্যে ঝনক্ ঝনক্ মরণের পয়েল বাজছে, বুঝতে পারে টগর। বড় ক্লান্তি আসে, আর বেশিদিন নয়। পরোজকে খুব বেশি দিতে পারা যাবে না। তাই উজার করে সুমনকে সব ঢেলে দিতে মন চায়। তুই নিয়ে নে সুমন। গভীর রাতে ধমক দিয়ে জাগিয়ে রেখে চাচাজী যা দান করে গেছেন। যা সামান্য সে নিতে পেরেছে তাতেই বান ডেকে গেছে টগরের ছোট দীঘিতে। আঁজলা করে কতটুকু নিতে পারবি সুমন? আয় সব ছেড়েছুড়ে জলে নেমে আয় সুমন। তোকে দিলে তবু একদিন পরোজ সব পাবে। নইলে কী করবে হতভাগাটা? দাদার মত টাই লাগিয়ে অফিস কাছারি করবে?

কিন্তু সুমনকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে চলেছে আবদুল লতিফের পাগল করা পরুষ আকর্ষণ। সে রাগরাগিণীর পিছনে ছুটে যৌবন খোয়াতে রাজী নয়। সে সুবাতাসে তরী ভাসাবে না। সে সব নিয়ে দুরন্ত বেগে আবুকে ভাসিয়ে দিতে, নিজে ভেসে যেতে চায়।

যাস নে, সুমন যাস নে।

সুমন শুনল না। গেল।

অনেকদিন অনেক আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য কবে শেষ পর্যন্ত টগরকে যেতে হল কাশী। যেতে হল এলাহাবাদ। মন বিক্ষিপ্ত ছিল। তবু গান দুর্দান্ত জমল: হায় হায় করতে লাগল শ্রোতারা। গানের পর দাওয়াৎ ছিল উপাধ্যায়জীর কুঠিতে। হোটেলে ফিরতে রাত হয়ে গেল। বুকের ওপর কে যেন বিশমণি বোঝা চাপিয়ে রেখেছে। শুলেই অস্বস্তি। মাথার পিছনে কয়েকটা বালিশ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে দিল টগর। ভোরের আলোয় আয়নায় নিজের আধভূতুড়ে চেহারা দেখল টগর। তারপর ঘুম!

ডাক্তারের পরামর্শ না শুনে সেদিনই ট্রেনে চাপল টগর। এ-সি-সি কামরা। ধুলো বালি গোলমাল কিছু নেই। ঘুমের বড়ি খেয়ে টুপ করে ডুবে যাওয়া শুধু।

বাড়ি ফিরেই দেখে কেঁদে কেঁদে মেহবুবার চোখ লাল। মাঝরাতে কখন নিঃশব্দে সুমন বাড়ি থেকে চলে গেছে। ছোট চিঠিতে ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি নাটক যথারীতি করে গেছে।

বারান্দায় এসে একটুখানি বসল টগর। বিভাসটাও এ সময় নেই। গেছে

হায়দ্রাবাদ কী একটা সেমিনারে। বড় নিঃসঙ্গ মনে হল নিজেকে। পরোজ একলা ঘরে ঘুমুচ্ছে। স্নানের ঘরে ঢুকে শাওয়ার খুলে দিয়ে মেহবুবা কাঁদছে। একটু বাদে ফিরোজা আসবে। গলা জড়াজড়ি করে চোখের জল ফেলবে দুই সখী। তাতে কি সুমন ফিরবে?

চেনাজানা সব জায়গা গেল টগর। কাউকে কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ তাকে দেখে সবাই অবাক। সুযোগ পেয়ে কেউ কেউ অনুযোগ করলেন। আমাদের তো ভুলেই গেছ! এতদিন বাদে মনে পড়ল। ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? মোটকথা, সুমন কোথাও নেই।

সুমনের, আবুর বন্ধুবান্ধব। যাদের টগর চিনত, তারাও দেখা গেল কেউ কিছু জানে না। শুধু ঘোরাই সার হল।

বেহালা কাজিপাড়ার মোড়ে আবার গাড়িটাও গেল খারাপ হয়ে। দুটো মিস্তিরি লাগিয়ে ড্রাইভারের হাতে গাড়ি ছেড়ে টগর ট্যাকসি নিল। সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে আসছে। বুকের ভিতর থেকে তিরতিরিয়ে উঠে আসছে —সুমনের জন্য কষ্ট, না শুধুই শারীরিক ব্যথা? ঠিকমত নিশ্বাস নিতেও যেন পারছে না। আঁখির বাড়ি যাওয়া তো হল না!

হঠাৎ দারুণ মৃত্যুভয় জাগল টগরের। আমি কি মরে যাচ্ছি? কিন্তু আমি তো এইভাবে ট্যাকসির মধ্যে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া কেন্নোর মত মরতে পারি না! আমি শিল্পী। আমি গাবাইয়া। আমি উস্তাদ বুরহানউদ্দিনের প্রধান শাগীর্দ, তাঁর ঘরানার ঝাণ্ডা উঁচা রাখনেওয়ালা উস্তাদ করিম-উদ্দিন খাঁ। আমি মরব তানপুরা হাতে, গলায় গান নিয়ে। গোলাম আলি বলতেন হাওয়া দিয়ে ছবি আঁকা! সেই হাওয়া দিয়ে ছবি আঁকতে আঁকতে! যেমন ভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের তাজা রক্ত উঠে এসে গান্ধারে পঞ্চমে ঋষভে নিষাদে ছড়িয়ে পড়বে।

ট্যাকসিটা ছেড়ে দিয়ে টালুমালু টগর হাঁটতে লাগল। দু চোখ প্রায় বন্ধ। এখন তো সন্ধ্যা নয়। তবে এত অন্ধকার নামল কেন? একি নিজের বাড়ির দিকে চলেছে টগর? রাস্তাটা চেনা মনে হচ্ছেনা তো। বাড়িগুলো অচেনা। ওই টেলরিঙের দোকানটা কবে হল? ডঃ মজুমদারের ওষুধের দোকানটা এপাশে ছিল না? এত কাক চেল্লাচ্ছে কেন? মীর খাঁ সাহেবের পাহাড়ি ময়নাটা চিৎকার করে ডাকল না? বে-এ-এ-টা? চাচাজী, আমি কি তোমার কাছে যাব? আশোয়ারীটা যদি আর একটু তালিম দিয়ে দিতে! সুমন, ফিরে আয় মাঈ। তোর মাটা বড় বোকা। বোকা না হলে সবাইকে খুশি করতে চাইবে কেন? বিভাস......পরোজ......মেহবুবা। মেহবুবা!

জোড়
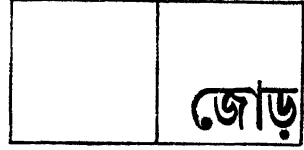
পূবের আকাশ কেমন ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে এল।

জানলার পাশে বিছানায় বসে চুপ করে দেখছিল আঁখি। এটা তার নিত্যনৈমিত্তিক। সত্যনাথ চলে যাবার পর বড় খাটে শোবার অভ্যেসও গেছে! হালকা ছোট পালংটা প্রায়ই ঘরের কোণা পালটাত। কোনো আসবাব দীর্ঘদিন এক জায়গায় স্থিতু রাখতে পারে না আঁখি। ঠাঁই বদল করিয়ে বৈচিত্র্য আনা! চোখের আরাম একটুখানি। কিন্তু পূবের জানলার কাছে খাটটা মনিয়ার মা আর নীতু দুজনে মিলে সরিয়ে দেবার পর আঁখি আর সেটা নাড়েনি। ওটার ওপর কখনো বজ্রাসনে, কখনো বা এলিয়ে বসে ভোর হওয়া দেখে।

রাত সাড়ে তিন, চার। একদা ওই সময়ে ঘুমজড়ানো চোখে গলা সাধতে বসতে হত। বাবা ঠেলে তুলে দিতেন। সামান্য জ্বরজারিতেও রেহাই ছিল না। শরীর থাকলেই শরীর মাঝেমধ্যে খারাপ হবে। তা বলে রেওয়াজ বন্ধ থাকতে পারে না। অল্প বয়সেই মেহনত করে নাও। পরে তো গলা শক্ত হয়ে যাবে। এতটুকু নোয়ানো মোড়ানো যাবে না। বেশি ঠেললে চিরে যাবে, ফেটে যাবে।

বিয়ের পর চর্চাতে নানাকারণে ঢিল পড়ে গিয়েছিল। কাশী গিয়েতো পুরো বন্ধ। শাশুড়ী আচমকা কোনো সন্ধ্যেবেলা গঙ্গার বুকে নৌকো চেপে ঘুরতে ঘুরতে বলে বসতেন বউমা, একটা হরপার্বতীর গান গা তো! আঁখির ইচ্ছে হত জিজ্ঞেস করে, মা তবে কি আপনাদের ভক্তি মহাভক্তির জীবনে হরের পাশাপাশি পার্বতীরও একটু জায়গা আছে? ইচ্ছে হত বদমেজাজী ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে রুখে যায়। বলে, গান গাইব না। কেন গাইব? আপনি তো আমার গান গাওয়া বন্ধই করে দিয়েছেন। কিন্তু কিছুই বলা হত না। মণিকর্ণিকা ঘাটের চিতাগ্নির দিকে চেয়ে তার গলা পর্যন্ত ঠেলে আসা কান্না গিলে ফেলে যা হোক একটা ভজন শুরু করে দিত। তীরথ মে না, মূরত মে না, ম্যয় তো তেরে পাশমে। সিধা বসে তিনি চোখ বুজে হয়তো গানই শুনতেন। হয়তো মালা ভর্তি থলে হাতে নিয়ে শুধুই জপতেন। কে জানে, কোনটা মন দিয়ে করতেন। কখনও মুখ ফুটে তো বলেন নি, বাঃ বেশ। অথবা দেননি ভুল হয়েছে বলে ধমক। বাবা যেমন দিতেন। ছাড়াছাড়ি ছিল না একেবারে।

ঘরভর্তি লোকের সামনে বকুনি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। বাসি বিয়ের দিন সকালে গাইতে বসলে মাসীরা সব বাবাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন: দেখবেন জামাইবাবু। আজ যেন আবার আঁখিকে গালমন্দ করবেন না। নতুন জামাই রয়েছে কিন্তু।

বাবার কথা মনে হলেই চোখে জল চলে আসে আঁখির। গান ছাড়া বাবা আর কিছু জানতেন না। খ্যাতি বল, খাতির বল,—তার যা কিছু সব ওই বাবার জন্য। গরীব স্কুল শিক্ষক। ঘষে ঘষে অ্যাসিসট্যানট হেড মাসটার হয়েছিলেন রিটায়ারের আগটায়। বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সাধ্যের অতিরিক্ত করে। তবু কারো মন পাননি। বেয়াই বেয়ানরা সামনা সামনি নাক সিঁটকেছিলেন দান সামগ্রী দেখে। বড় জামাই রতীন্দ্র মানুষটা ভাল। বাসর ঘরে বউ 'আ-আ-মি বনফুউল গো' গান গেয়ে তাকে এত মুগ্ধ করে দিয়েছিল যে পরবর্তী কালে মাঝে মাঝে রূপার কাছে ওই গানটা ছাড়া অন্য কিছুই আর শুনতে চায় নি। তার কাপড়ের ব্যবসটা জমে যেতে গানের কথা বেমালুম ভুলেও গিয়েছিল একদিন। রূপাও আর গলা খোলেনি। ক'বছরেই অমন হাফ-এ-ডজন আণ্ডাবাচ্চা পয়দা করে গোল টোমাটো বনে গিয়েছিল।

দারুণ মিঠে গলা ছিল মেজ বোন দীপার। ন্যাচারাল ভয়েস. ভগবানের দেওয়া ঐশ্বর্য ছিল সে কণ্ঠে। দেখতেও অবশ্য তিন বোনের মধ্যে দীপাই সবচেয়ে ভাল। রূপার মত ফর্সা নয়। তবে চাপার মধ্যে চোখে লাগার মত গায়ের রঙ। দুর্দান্ত ফিগার। নতুন গোঁফ ওঠা ছেলেরা আখছার বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে পপাত হত আচমকা দীপার দেখা পেলে। আর, স্বীকার করাই ভাল, ভক্তবৃন্দের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াবার বিশেষ আগ্রহ দীপার তরফে ছিল। মা খুব বকাবকি করেও স্বভাব শোধরাতে পারেন নি। বাবার ভয়ে দীপা পবন মাস্টারের কাছে তানপুরা নিয়ে বসত। কিন্তু মন ফেলে রাখত অন্যত্র।

সেই সময় হঠাৎ জ্যাঠামশাই মারা গেলেন। পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি তিনিই দেখাশোনা করতেন। বাবা পড়ে গেলেন মহাবিপদে। তবে দায়িত্ব এড়ানোর স্বভাব তাঁর ছিল না। একদিকে স্কুল, অন্যদিকে উকিল-কোর্ট-কাছারি নিয়ে বাবা হিমসিম খেতে লাগলেন। বছর দেড়েক বাদে দীপার গান মন দিয়ে শুনতে গিয়ে তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল। অমন সুন্দর গলার কী হাল করেছে অপদার্থ অলস মেয়েটা। বাবার কাছে রামবকুনি খেয়ে দীপা মার কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগল। মা বললেন, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর। হীরাবাঈ সরস্বতীবাঈ তোমার ছোট মেয়ে হোক। দীপা যখন চায় না, ওকে রেহাই দাও। রাত্রিবেলা স্বামীকে আরও দুচারটে খবর একান্তে জানালেন। পরদিন থেকেই বাবা কাকারা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। শহরের সবচেয়ে ধনী পরিবারে

একরকম চেহারার জোরেই দীপা বধূ হিসাবে প্রবেশের ভিসা পেয়ে গেল।

বাসরঘরে গান গাইতে বসল আঁখি। সেই তার বলতে গেলে প্রথম পাবলিক পারফরমেনস। পুলকিত সমরেশ শালীকে বললে, ফাসকেলাশ গাও বটে তুমি। পাড়ায় সরস্বতী পুজোয় আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট। এবার কিন্তু তোমায় গাইতে হবে।

দীপা চটে লাল। কী আর গায় ও। ও-তো অঘা। আমি ওর চেয়ে হাজার গুণ ভাল গাই। আমি গাইব আপনাদের ফাংশনে।

অপ্রতিভ সমরেশ বললে, ধ্যাৎ, তুমি তো ঘরের বউ। তুমি আবার গান গাইবে কি! লোকে নিন্দে করবে না?

তা লোকে নিন্দে করবার সুযোগ পায়নি। কারণ দীপা কোমরবেঁধে গান গাইতে বসেনি কোথাও। একই শহরে, তাও মফঃস্বল শহরে, বাপের বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও দীপা শ্বশুরবাড়ির জেলখানাতেই আটক। এক, পুজোর পর কয়েক ঘণ্টার জন্য সমরেশ বউকে নিয়ে কুটুম সেজে আসত। ব্যস ওই পর্যন্ত। সমরেশ আর কোনোদিন ছোট শালীকে গাইতেও বলেনি। একদিন দীপা তার গানের ঘরে ঢুকে তানপুরায় হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদছিল। দেখে আঁখিরও দুচোখ ফেটে কান্না এল। গাইবি দিদি? গা না। সমরেশদা কেন একটু চেষ্টা করেনা রে? ওঁকে বল্ না তুই দিদি। ও-বাড়ি না হয়, এ বাড়িতে এসে তুই আমার সঙ্গে বসে যা। সোম বুধ শুক্র। তিনদিন তবলা আসে বাড়িতে। চলে আয় না যে দিন ইচ্ছে।

কান্নাভেজা মুখ তুললে দীপা। তার চোখে দ্বিধা আর লোভের লুকোচুরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর আসেনি দীপা।

ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে আঁখি। পরে, ঠাণ্ডা মাথায়। দীপার গান হবার নয়। তার ভেতর থেকেই যে কোনো তাগিদ ছিল না। শাস্ত্রীয় সংগীত বলে কথা নয়। রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, নজরুল—মায় আধুনিক গান, যাই ধর না কেন। ভাল গলা হলে খুব ভাল। অনেক খানাখন্দ পাঁচিল দেয়াল তুমি আগেই পেরিয়ে বসে আছো। কিন্তু তারপর তোমাকে তো মেহনৎ করতেই হবে। কঠিন সাধনা যাকে বলে। তার কোনো বিকল্প নেই।

আসলে দীপার মত কারুকাজকরা গলা নিয়ে মেয়েদের সহজে গান হয় না। কোথায় যেন অভিশাপ আছে। কোনো দুর্বাসা মুনির। লতা আশা সন্ধ্যা, এঁরা ব্যতিক্রম। যাদের গলায় প্রকৃতি দেবী উজাড় করে পান্নাচুর্ণি-হীরে মুক্তো দিয়েছেন, তারা শুয়ে বসে সময় কাটিয়ে দেয়। ঠেলে সিনেমা দেখে, তাস খেলে, আড্ডা মারে, ফিসফিসিয়ে রঙ্গরস করে, কানগরম হওয়া কথা চালাচালি করে, চেনা ছেলেদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয়, তারপর অচেনা কোনো পুরুষের পিছু পিছু বেনারসী শাড়ি পরে ছেলেপুলের মা হতে যায়।

আর যাদের গলা ঘষাপাথর, তারা দেখ কেমন মুটেমজুরের মত খেটেই যাচ্ছে, খেটেই যাচ্ছে। খাটতে খাটতে যদি শেষ পর্যন্ত ওই পাথর একদিন ঝকমক করে ওঠে। যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে মা সরস্বতী তাঁর দুর্লভ আশীর্বাদ বর্ষণ করে দেন। যদি।

আঁখির শ্বশুর, সত্যনাথের বাবা আদিনাথ, বলতেন: বুঝেছ মা, আমাদের এই আইন ব্যবসা বড় কঠিন জিনিষ। সবার হয় না। লোকে বলে ব্যাকিং ব্যাকিং। হ্যাঁ, ব্যাকিং থাকলে বড়জোর অ্যাটর্নি হওয়া যায়। বার-এ নামডাক হওয়া অন্য ব্যাপার। কথায় বলে কেউ আইন পড়তে যাচ্ছে শুনলে ট্রাই টু স্টপ হিম। ডিসকারেজ হিম। দোজ দ্যাট ওন্‌ট বি ডিসকারেজড আর দোজ দ্যাট আর লাইকলি টু সার্কসিড। এইজন্য দ্যাখনা সত্যকে আমি ল' পড়বার জন্য চাপ দিলাম না। কেমিস্ট্রি পড়বি, তো পড়। মাসটার প্রফেসার যা ইচ্ছে হোস। তা, খারাপ তো কিছু হয়নি। অত বড় কোমপানির অফিসর। ডিরেকটরও হবে একদিন। কিন্তু ব্যারিসটার? নো, হি ইজ নট দ্য ফাইটিং কাইনড।

শ্বশুরমশায় তাঁর সংগ্রামী স্পৃহা অবশ্য হাইকোরট সুপ্রীম কোরট-এর মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছেন। বাড়ি বয়ে আনেননি। শাশুড়ী নইলে—

কিন্তু ওই যে আইনের ব্যাপারে যা বলেছেন সেটা খাঁটি, গানের বিষয়েও। যারা শিখতে আসে তাদের উৎসাহ না দিয়ে ভয় খাইয়ে দেওয়াই ভাল। তাতেও যদি না দমে বুঝতে হবে দম আছে। হবে শেষপর্যন্ত। আঁখি তাই করে। মাঝেসাঝেই নানা ধরনের মেয়েরা আসে, গান শিখব দিদি আপনার কাছে। প্রথম প্রথম চট করে রাজী হত। এখন আর হয় না। বলে, দ্যাখ, গান বড় সাংঘাতিক সাধনা। বিশেষত শাস্ত্রীয় সংগীত। সারা জীবন লেগে থাকতে হবে। পারবে? পারবে সিনেমা থিয়েটার, অমুক মাসীর বিয়ে, তমুক দাদার জন্মদিন ভুলে গিয়ে রেয়াজে বসে যেতে? পারবে সহ্য করতে যদি কেউ কখনও আসরে গাইতে না ডাকে? যদি পার তবে এসো। আমি শেখাব।

গারজেনদের জিজ্ঞেস করে: কেন মেয়েকে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখাচ্ছেন? কী লাভ হবে? বিয়ের ব্যাপারে কোনো কাজে কিন্তু আসবে না। তার চেয়ে অন্য গান শেখান। চট করে শিখেও যাবে। দুদিন শিখে হারমোনিয়ম নিয়ে সবার সামনে বসেও যেতে পারবে।

ভড়কে গিয়ে দুচারজন কেটে যায়। কিন্তু খুব লাভ হয় না। কারণ বিষয়টা কত দুরূহ তারা বুঝতেই পারে না। মাথা নেড়ে চলে যাওয়া অভিভাবক দুমাসের মধ্যেই মেয়েকে তাগিদ দেন। কীরে? এতদিন হয়ে গেল, কটা রাগ শিখলি? আঁখিকে শুনতে হয়—ওকে আর একটু যত্ন নিয়ে গানটান দিন। সারেগামা সেধে আর কতকাল কাটবে? অমুক বাবু, তমুক দিদি, তাঁদের ছাত্রদের কত তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দেন। ইত্যাদি।

অমুক বাবু, তমুক দিদিকে আঁখি বিলক্ষণ চেনে। তাঁরা যা লয়কারী করেন, তাও জানে। ক্রিমিন্যাল ব্যাপার সমস্ত। একসঙ্গে বিশ তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে বসেন। দুই লাইন গান ডিকটেট করে খাতায় লিখিয়ে দেন। একটু গেয়ে দেখিয়ে দেন গানের ওঠানামা চলা। দুচারটে পালটা। আবার দশমিনিট গান। বাস ক্লাশ ডিসমিস। 'পরের হপ্তায় আবার আসবে সব। সেদিন নতুন আর একটা রাগ।' এইতো তালিম!

উস্তাদজীর মুখে তাঁর উস্তাদের কাহিনী শুনেছে আঁখি। কিশোর বুরহানউদ্দিন তখন পাকাপোক্ত তালিম নিতে শুরু করেছেন গুরুর কাছে! গুরু দিলরুবা নিয়ে বসেন। গেয়ে দেখান। চেলাকে বলেন, সাথমে আ। ইতস্তত করে বুরহান একদিন বলেই ফেললেন। একটা তম্বুরা কিনে নি। যদি আপনি অনুমতি করেন।

গুরু তো মহা চটিতং। অমুকের বাচ্চা অমুক, এতবড় তোর আস্পদ্দা। দুবছর গান শিখতে না শিখতে তম্বুরা চাই। লাথি মেরে খেদিয়ে দেব সব। যা নদীর ধারে গিয়ে স্রোতের শব্দের সঙ্গে গলা মেলা। কেন, বাতাস বইলে পাতার শিরশিরানি শুনতে পাস না? আকাশে মেঘ ডাকলে? বৃষ্টির আওয়াজ পাখির ডাক, কানে ঢোকে না? তম্বুরা চাইছিস বড় মুখ করে?

সাজা দিয়েছিলেন ছ-মাস গান বন্ধ। কাজ লকড়ি ফাড়া, ঘরদোর সাফ, চুলা লাগানো, রান্নার জোগাড় দেওয়া। রান্নাটা মুসলমান উস্তাদরা সাধারণত নিজেরাই করতেন। কে কখন বিষ মিশাবে। অথবা সিঁদুরের ডেলা। চৌপট হয়ে যাবে গলা। প্রাণ নিয়ে পড়বে টানাটানি। কাউকে বিশ্বাস নেই।

এখন এসব গুরুগিরি ফলাতে গেলেই হয়েছে আর কি! চাটি বাটি উচ্ছেদ হয়ে অরোভিল চলে যেতে হবে। অল্পে পার পাবে না।

আঁখি বলত, বাবা, আমি বিয়ে করবনা বাবা। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দেখ তো, তারা থেকেও নেই। আর ভাইবোন নেই আমার। তোমাকে মাকে কে দেখবে? আমার বিয়ে হলে তোমাদের কী দশা হবে? আমার গানের কী হবে?

বাবা বলতেন, পাগলী। গান তো রইলই। তা বলে বিয়ে করবিনা কেন? তোর ব্যবস্থা না করে আমি তো মরতেও পারব না। বিপদে আপদে কে তোকে দেখবে বল?

ফাঁকা ঘরে আঁখি আজ কেঁদে ওঠে। সবই তো ইচ্ছেমত করলে বাবা। কিন্তু কী লাভ হল? বিপদে আপদে কে আমায় দেখছে। তোথায় তোমরা সব, আমার অভিভাবকের দল?

সেবার কাশীতে গান করতে গেছে আঁখি। ওখানকার বাঙ্গালীরা পুজোর সময় একটা গানের কমপিটিশন লাগিয়ে দিয়েছেন। নদীর ধারে পঞ্চকোট রাজবাড়ি সংলগ্ন কালীমন্দির। তার চত্বরে সামিয়ানা খাটিয়ে জলসা বসেছে।

কাশীর প্রবীণতম বাঙালী আউদগারবির বাসিন্দা রমণীরঞ্জন লাহিড়ি মশায়কে জোরজার করে এনে সভাপতি বানানো হয়েছে। উনি বলছেন সারাজীবন গীতাপাঠ করেছি, সামগানের আমি কী বুঝি। বলছেন আর আবক্ষলম্বিত ধবধবে শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদুমন্দ হাসছেন। বিচারকমণ্ডলীতে আছেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ, ভীষ্মদেব, দীপালি নাগ আর ভিষকাচার্য-তবলিয়া আশু ভট্টাজ।

তার আগেই পাটনা গয়া কর্মাপিটিশনে গেয়ে আঁখি খুব নাম করেছে। একগাদা কাপ শিলড রুপোর একটা বীণা জিতে বাড়ি বয়ে এনেছে। ওই বীণাটা বিচারকের হাত থেকে নেবার সময় আঁখির কী আনন্দ। কিন্তু রানিং ছিল বলে একবছর বাদে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। সেটা ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর। নইলে আঁখি আবার যেত কর্মাপিটিশনে। বীণাটা চলে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। খুব মুষড়ে পড়েছিল আঁখি। বাবা বললেন: 'কাঁদিস না বেটি, বীণা তোকে আমি বানিয়ে দেব।' তাই কি পারেন। গরীব স্কুল মাসটার। হৃদয় ছিল রাজার। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে শিক্ষকদের বেতন উল্লেখ করতেই লজ্জা।

হাত পেতে কাপ শিলড নিতে আঁখির কেমন অস্বস্তি লাগত। যাঁরা কর্মাপিটিশন করেন একটু হুঁশ কেন তাদের থাকে না? স্বচ্ছন্দে তাঁরা গানের বই দিতে পারেন। ভাতখণ্ডেজীরই হোক আর রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির বইই হোক। মীরাবাঈ রচিত ভজনসংগ্রহ। গীতগজলের সংকলন। সুরেশবাবু, যামিনীবাবু, নীলরতন বাঁড়ুজ্জে কেমন সুন্দর সুন্দর বই লিখেছেন। তা না দিয়ে প্লেটিং করা কাপ। যেন একশ মিটার দৌড়ে এল কেউ।

দৌড় জিতেও আঁখি ছেলেবেলায় একটা ট্রফি পেয়েছিল। এগরেস না স্পুন রেস কী যেন নাম ছিল দৌড়টার। মোটকথা চামচের উপর সেদ্ধ ডিম বসিয়ে দৌড় লাগিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেল। কী হাততালি। হাতে তার চামচ, তার ওপর ডিম, এসব আসলে আঁখির খেয়ালই ছিল না। দৌড়ে যাবার তাগিদটাই ছিল। হয়তো সেই কারণেই পড়েনি ডিমটা। যেমন পাশের বাড়ির চামেলিরটা, দুপা যেতেই পড়ে ফট্টাস। ভুলে ওকে কাঁচা ডিম দিয়ে দিয়েছিল। তাই নিয়ে চামেলির বাবা জগবন্ধু কাকার কি রাগ। চেঁচাতে লাগলেন, সব সাজান। চিটিংবাজি। দেব মামলা ঠুকে। পেশকার জগবন্ধু কথায় কথায় অমন তড়পাতেন। চামেলিকে একবাক্স টফি কনসোলেশন প্রাইজ দিয়ে সবাই তাঁকে ঠাণ্ডা করে। আঁখির দেখাদেখি মেয়েকে গানের ঘরেও জুতে দিয়েছিলেন তিনি। ফল হয়নি। গানের মাস্টার এলেই চামেলি বলত পেটের অসুখ করেছে। ঘুষের টাকায় তিনখানা বাড়ি তুলেছিলেন জগবন্ধু কাকা। কিন্তু মেয়ের উদরাময় কখনও ঠিকমত সারাতে পারেননি। তবে ভুগে ভুগে মরে যাবার আগে পর্যন্ত বলে গেছেন, ওই মাস্টারের মেয়েটা তো? কী এমন আহামরি গায় বুঝিনি বাবা। পারে কেত্তন গেয়ে চোখে জল আনতে?

এগুলি সব ভাগ্য বলে মেনে নেয় আঁখি। এই এক বিচিত্র ঈর্ষা বরাবর তার সঙ্গী। জগবন্ধুকাকা তো পাগলছাগল মানুষ। চামেলিটাই বা কী? কিন্তু এমন এমন অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে ঈর্ষার জ্বালা ঝলক তার মনকে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে যে বলার নয়। অকারণ কটু সমালোচনা, অহেতুক বিদ্বেষ, এসব বোধকরি সব শিল্পীরই অদৃষ্টে অল্পবিস্তর জুটে থাকে। অভিযোগ করার অর্থ হয় না!

অবশ্য ভালবাসাও কম আসে না। সেটা স্বীকার না করা চরম অকৃতজ্ঞতা হবে। কত অচেনা মানুষ অযাচিতভাবে এসে আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন কত আসরের শেষে। তাঁদের কথা ভাবলে চোখে জল আসে। মাথা নুয়ে পড়ে ঋণভারে। বার বার নমস্কার জানাতে হয়।

কাশীর সেই কর্মপিটিশনে আচমকা দীপা এসে হাজির শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের নিয়ে। সমরেশের পাশাপাশি দাঁড়ান দীর্ঘদেহী আদিনাথ মৈত্রকে সেই প্রথম দেখল আঁখি। সমরেশদের দূর সম্পর্কের মেসো। স্ত্রীর অসুখ শুনে আদিনাথবাবু দিল্লি থেকে বেনারস এসেছেন। দীপারা বীরেশ্বর শিবের পুজো দিতে। পুত্রসন্তান চাই। সবার সঙ্গে আদিনাথবাবুকেও প্রণাম করলে আঁখি। আহা থাক থাক—ব্যস্ত হয়ে পিছিয়ে গেলেন সাহেবী পোষাকপরা সুন্দর মানুষটি। শু খুলে মোজা খুলে মন্দির চত্বরে নেমেছেন। ধবধবে শাদা পা।

গান শুরু করার আগে যত উৎকণ্ঠা। শুরু হয়ে গেলে আঁখির আর কোন খেয়াল থাকেনা। একেবারে ডুবে যায়। শেষটায় হাততালির শব্দে তার জ্ঞান যেন ফিরে আসে। আরও ছেলেবেলায় সব গানই গাইত। মায় আধুনিক পর্যন্ত। পরে ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ঠুমরী ভজন। এক ভজনটা তত উৎরাল না। বাকি চারটে গ্রুপেই আঁখি প্রথম। সব মিলিয়েও প্রথম। খুব প্রশংসা কুড়ালো আঁখি। সোনাবসানো মেডেল, কাপ, বিচিত্র হিন্দীতে লেখা সার্টিফিকেট, মিঠাই এক প্যাকেট নীল রিবনমোড়া, আর এক কৌটো বিশ্বনাথ গলির জর্দা! ওই জর্দার ব্যাপারটা নিয়ে পরে খুব হাসাহাসি হয়েছে। আসলে জাজদের পানের সঙ্গে খাবার জন্য কয়েকটা কৌটো টেবিলে রাখা ছিল। তারই একটা ভীষ্মবাবু অন্যান্য পুরস্কারের সঙ্গে দিয়ে ফেলেছেন।

অনুষ্ঠান শেষে কলকাতার বড় কাগজের প্রতিনিধি এসে বললেন, ছবি তুলব একটা। রিপোরট লিখব কাগজে। হাত ধরে বাবা বললেন, না না, ওসব করবেন না। তাহলে ওর মাথা ঘুরে যাবে। গান হবে না। সাংবাদিক বাবু নাছোড়। গলৎ কথা বলছেন আপনি। কত মেড়ুয়াকে কাটান দিয়ে আপনার ডটার পরথম হল। আমাদের বাংগালিদের পক্ষে কত গর্বের কথা হচ্ছে। বঙ্গের বাহিরে বাংগালি বলে আমি ছাপিয়ে দেব।

আদিনাথবাবু বাবাকে বললেন, 'আই অ্যাম মোসট ইমপ্রেসড। না না, মেয়ের কথা বলছি না। সে তো দারুণ অ্যাকমপ্লিশড। আমি আপনার হিউমিলিটির কথা বলছি। এযুগের মানুষ হয়ে আপনি মশায় পাবলিসিটি চান না! স্ট্রেনজ।' বাবা আরও লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

বড়ে মতিবাঈকে গল্পকাহিনীর মানুষ বলে মনে হত। বাবা নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বয়সের হরেক কারিকুরি করা মুখ, যেন বিষাদের রিলিফ ম্যাপ! একশ এক টাকা প্রণামী খুশী হয়ে নিলেন, কিন্তু কিছুতেই প্রণাম নিলেন না আঁখির। খবর্দার। আমি তো নালানর্দমার জেনানা। লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে তুমি। ঘরের বউ হবে দুদিন বাদে। এমনিতেই পাপের ভারে দেখ আমি মরতেও পারছি না। আর পাপ বাড়িও না আমার।

মউজুদ্দিনের ভাঙগা কবরের পাশে নিয়ে গেলেন। চোখে জল। ঠোঁট নড়ছে। বোধ হয় দোয়া ভিক্ষা করছেন হতভাগ্য গায়কের জন্য। অথবা তাঁর চেয়েও দুর্ভাগা যারা দুনিয়ায় পড়ে আছে আজো, তাদের জন্য।

এলাহাবাদ ঘুরে কলকাতা ফেরা হল কার্তিকের শেষাশেষি। আর আঁখির বিয়ে হয়ে গেল ফালগুন মাসে। ভবানীপুরে মামাবাড়িতে উঠেছে আঁখিরা। কলকাতায় এলে বাবা ওইখানেই ওঠেন সাধারণত। তা নিয়ে আক্ষেপ আছে অন্যান্য আত্মীয়দের। কিন্তু কী করা যাবে। ভবানীপুরের মত সুবিধে কোথায়? বিশেষত গানবাজনা শুনতে হলে। আর কলকাতা আসা মানে সংগীত সম্মেলনের আকর্ষণ। নয়তো ক্রিকেট। আর কী আছে কলকাতায়? হ্যাঁ, মা আছেন। মা আছেন কালীঘাটে, ঠনঠনিয়া আর দক্ষিণেশ্বরে। ব্যস।

এক রবিবারের ভোরে গাড়ি হাঁকিয়ে আদিনাথ মিত্তির এসে হাজির। আলিপুরের উকিল হলেও বীরেনমামা ব্যারিসটার সাহেবকে চেনেন। কে না চেনে? শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কোনো ভণিতা না করে আদিনাথ বললেন, আঁখিকে আমি ঘরে নিতে চাই। আমার একমাত্র সন্তান সত্যনাথের জন্য। নিজের ছেলে বলে গর্ব করছি না। সত্যনাথ আপনার মেয়ের অনুপযুক্ত হবে না। আমি নিজে খুব আইডিয়াল চরিত্রের লোক নই। কিন্তু সত্যনাথ নিষ্কলংক। বাট দেন ইউ ডোনট হ্যাভ টু টেক মাই ওয়ারড ফর ইট। আপনি আমার বাড়ি আসুন। যদি ফ্রি থাকেন আজই আসুন। আলাপ করে যান ওর সঙ্গে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, আমি বেনারসেই প্রোপোজালটা দিতাম। কিন্তু স্ত্রীর সম্মতি পাইনি। উনি আবার অসুস্থ থাকলে একেবারে মৌনী হয়ে যান। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেন। হাউ এভার, আমার স্ত্রীর চিঠি পেয়েছি কাল। স্বপ্নে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ পেয়ে গেছেন। আই মাসট কনফেস, আই ডু নট আনডারস্ট্যানড দিজ থিংস ভেরি মাচ। তবে মোট কথা হল, দ্য ম্যারেজ ইজ অন। অবশ্য যদি আপনারা এগ্রিয়েবল থাকেন।

দ্য বল ইজ ইন ইয়োর কোরট নাউ। বাবা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। মামা হেসে বললেন, কি জামাইবাবু, আপনার ভাবী বেয়ান অসুস্থ হলে কথা কন না। আপনি তো দেখছি সুস্থ অবস্থাতেই মৌনীবাবা। অত কথা কয়ে গেলেন মত্তির সাহেব। আপনি সেই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইলেন।

বাবা বললেন, কী করা যায় তুমি বল। এতো আর ভারব অব ইনকমপ্লিট প্রেডিকেশনের ডেফিনিশন বলা নয়, বা শের শা-র শাসন ব্যবস্থা বর্ণনাও নয়। এত গভীর জলে গরীব টিচার আমি লগি ঠেলি কেমন ভাবে?

বিয়েটা স্থির হয়ে যেতেও বাবার বিহ্বল অবস্থা পুরো কাটল না। বারে বারে বলতে লাগলেন, ঠিক করছি কী না কে জানে। আঁখিটাতো খুব বাচ্চা। দুচোখ মেলে কিছু দেখলনা, এর মধ্যে সংসারে ভিড়িয়ে দিলাম। এত দুঃখ কষ্টে শেখা গান। অত বড়লোকের বাড়িতে গিয়ে বজায় থাকবে তো?

মা মাসীরা, মামা কাকারা হই হই করে ওঠেন। দ্যাখ কান্ড। এসব কোনো কথা? একটি নগদ পয়সা নিচ্ছে না। অন্য কোন দাবিদাওয়া নেই। আঁখি অবশ্যই গুণী মেয়ে। কিন্তু রুপা দীপার মত সুন্দরী নয়। তার অমন পাত্র জোটা। এতো রূপকথার ব্যাপার।

আঁখিও কেমন ঝিম মেরে গেল। বিয়ের জন্য সত্যি সে প্রস্তুত ছিল না। তার মাথায় তখন আস্থায়ী অন্তরা ঘুরছে। গলার রেনজ বাড়াতে হবে। গানকে বড় করতে হবে। ছোটবেলায় আদর্শ ছিলেন হীরাবাঈ। কতরাতের স্বপ্নে তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। হীরাদি হীরাদি বলে কত গল্প করেছে আঁখি। তিনি কেমন বাংলায় উত্তর দিয়েছেন। আঁখি বলেছে, জানেন হীরাদি, মা না আজ মোচারঘন্ট রেঁধেছে। আর নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল। খাবেন আপনি?

বোমবাই গাইতে যাচ্ছে। একই কামরায় নাগপুর থেকে এসে উঠলেন হীরাবাঈ। আঁখি তাঁকে এমন অভ্যর্থনা করে বসাল যেন ওটা রেলের ডিববা নয়, তার বৈঠকখানা। আচমকা দেখা হওয়ায় বাংলাতেই বলে ফেলেছিল, 'হীরাদি, আসুন আসুন।' কী কান্ড! হীরাবাঈ হেসে সরল হিন্দিতে বললেন, তুমি বাঙ্গালী। বাংলা বললে। বড় মিঠাস তোমাদের জবান। কলকাতা আমাকে অনেক ইজ্জৎ দিয়েছে। এখন অবশ্য আর ডাক পাই না। তা হোক। কলকাতায় গান গেয়ে যা আনন্দ তেমন আর কোথায়?

সারাটা পথ বসে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই গেলেন। গান সম্বন্ধে দুচার মিনিট কথা বলেছিলেন। বেশী প্রশ্ন করলেন হাতের গলার গয়নাগাটি নিয়ে। বাউটিটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। আঁখি ভাবছিল। কেন আর এঁর গান পরে অত ভাল লাগেনি? আপ্লুত হতে পারিনি, তাই। ভাল জিনিষ অবশ্যই

আছে। তবে সবটাই কেমন সরলীকৃত।

কোথা দিয়ে যৌবন এসেছে দেহে টের পায়নি আঁখি। সে রেওয়াজ নিয়ে মগ্ন থেকেছে। সিনেমা থিয়েটার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা এসবের সময় ছিল না তো! স্কুলের পড়াশোনা সেরে বাকি সময়টুকু গান আর গান। কত পূর্ণিমার চাঁদ আর কোকিলের ডাক তার গানের ঘরের বাইরে বৃথা বয়ে গেছে। আঁখি সুরের খামখেয়ালী পাখিগুলোকে বশ মানাতে ব্যস্ত। কূটতানের জটিল জাল বুনে যাচ্ছে। লয়কে আনতে চাইছে নিটোল বৃত্তচাপে। সরস্বতীর কৃপা। অত কঠিন সমালোচক বাবাও বলতেন লয়জ্ঞানটা মেয়েটার জন্মগত। আঁখির দেখেশুনে বিশ্বাস জন্মেছে, সব তৈরী করা যায় মেহনতের দৌলতে। লয় যায় না। হয় ওটা তোমার আছে। নয়তো নেই। কত বাঘা গাইয়ে বাজিয়েকে দেখেছে, ওই ডিপারটমেনটে খামতি।

সত্যনাথ যখন তার দেহের দখল নিতে এল আঁখি অপ্রস্তুত ছিল। সত্যনাথ খুব একটা কামুক পুরুষ নয়। ব্যাপারটাতে সেও অনভিজ্ঞ। দুচারটে পপুলার যৌনবিজ্ঞানের বই বিয়ের আগে পড়ে থাকবে। স্ত্রীকে তৃপ্তি দিতে পারছে কি পারছে না এই নিয়ে এতই ভাবিত রইল যে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন ম্যাটমেটে মেরে গেল। বিয়ের পর প্রথম মাসিক এসে আঁখিকে সত্যনাথকে দুজনকেই যেন স্বস্তি দিয়ে গেল।

বিয়েতে শাশুড়ী উপস্থিত ছিলেন না। গুরুদেব অনুমতি দেননি। তিনি কাশীতেই রইলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানিয়ে দিলেন বিয়েটা যেন পুরী গিয়ে হয়। আদিনাথ খুব অপ্রস্তুতমুখ করে এসে বেয়াইকে জানালেন সব। 'আপনাদের হয়তো খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু আমি সত্যি নিরুপায়।'

রাজী হতেই হল বাবাকে। সব টানাটানি করে পুরী নিয়ে যাওয়া। অনেকেই যেতে পারলেন না। অনেকে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন ব্যাপারটাতে। দোষ যেন সব বাবার। সত্যি কথা বলতে কি বরপক্ষও বিলক্ষণ অসুবিধেয় পড়ে গেল। তাদেরও ছুটোছুটির অন্ত নেই। যদিও শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই শুভকাজ মিটে গেল। সম্ভাবিত সমস্যার অনেকগুলিই দূর থেকে ভয় দেখাল। কার্যক্ষেত্রে খুব একটা বিপত্তি ঘটল না।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অচিরাৎ একটা সত্য বুঝে গেল আঁখি। শাশুড়ি থাকেন দূরে কাশীতে, হরিদ্বারে, তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে। কিন্তু তাঁরই অদৃশ্য শাসনে চলে মৈত্রভিলা-র জীবন। আদিনাথ সত্যনাথ, বাপবেটার কেউই বস্তুত স্বাধীন নন। পুরো তেতালাটা শাশুড়ীর মহল। একদিকে বড় বড় দুটো ঘর গুরুদেবের জন্য নির্দিষ্ট। দামী দামী পর্দা। দামী চাদরঢাকা পুরুগদী দেওয়া বিছানা। তার উপর হাসিমুখ গুরুদেবের ছবি। হাফশার্ট পরা মাঝবয়িসি ভদ্রলোককে দেখে মারচেনট অফিসের বড়বাবু মনে হয়। গুরুটুরুর চেহারা আদৌ নয়।

ওদিকটা অপেক্ষাকৃত ছোটঘরে শাশুড়ীর বিছানাপত্র। দেয়ালে ওই গুরুদেবেরই বেশ বড় সাইজের ছবি। একটা চাকর আলাদা বহাল তেতালার দেখাশোনা করার জন্য। রোজ সব ঝেড়েমুছে ঝকঝকে করে রাখে। ধূপধুনোর ছড়াছড়ি। সারা বাড়ি থেকে গোলাপফুল পদ্মফুলের গন্ধ উঠতে থাকে।

দোতলা সত্যনাথের। বিয়ের পর আঁখি-সত্যনাথের যৌথ সংসার। তাদেরও চাকরবাকর আলাদা। বাগানের দিককার ঘরটা আঁখি বেছে নিল গানের ঘর হিসাবে। সত্যনাথ নিজে গিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে এল আঁখির প্রিয় গাইয়ে বাজিয়েদের কটা ছবি। নিজের হাতে দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। সেই ছিমছাম সুন্দর ঘরে তানপুরা হাতে বসে আঁখির মনে পড়ল বাবার রিক্ত দুঃখী মুখ। চোখ জ্বালা করে জল এল।

অ্যানজাইনার ঝামেলা আছে আদিনাথের, পারতপক্ষে সিঁড়ি মাড়ানো বারণ। গোটা একতলা নিয়ে বেশ ফুর্তিতেই থাকেন ব্যারিস্টার সাহেব। খানসামা বেয়ারার উপর নির্ভরশীল, যতক্ষণ বাড়ি থাকেন। আঁখি এসে এটা ওটা সেটা করতে চায়। কেমন যেন লজ্জায় পড়ে যান আদিনাথ। বাপ ব্যাটা কারও ঠিক আত্মীয়া গোছের কারু কাছ থেকে সেবা নেবার অব্যেশ নেই। বেশ বুঝতে পারে আঁখি। থ্যাংক-ইউ-ট্যাংক-ইউ বলে অস্থির হয়ে যান আদিনাথ। আর যেদিন কোরট থেকে ফিরে ফুলবাগানে বসেছেন আদিনাথ, বেয়ারা সফেন গ্লাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে আর টেবিলে রেখে গেছে ছাড়ানো বাদাম, আঁখি নিয়ে এল গরম-গরম চিংড়ী মাছের বড়া আর গোলাপজলে-ভাজা মশলায়-আঁচারের তেলে জারানো ছোট ছোট কাবাব, ব্যারিস্টার সাহেব ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেলেন।

কয়েকটা মাস স্বপ্নের মত গেল। পিতা, পুত্র, বধু তিনজনের মিষ্টি সংসার। বাবা মা দুবার ঘুরেও গেলেন। মেয়ের অভাবে সব শূন্য। তবু আঁখির হাসিমুখ দেখে খুশী তাঁরা। সবই তারা মার কৃপা। সবচেয়ে আনন্দের কথা আঁখির গান ঠিকমত—অর্থাৎ নতুন সংসারে যতটা হয়—চলছে। মা বলেই ফেললেন, এখন একটা বাচ্চাটাচ্চা হবার কথা শুনি তো সব সাধ মেটে। বাবা চোখ পাকিয়ে বললেন, না না আঁখি, এখন নয়। গান বন্ধ হয়ে যাবে। মা গেলেন বিষম চটে। যত সব বাজে কথা তোমার। লজ্জায় লাল হয়ে আঁখি উঠে গেল পাশের ঘরে। মা বা যে কী বলেন। তবু একটা অজানিত সুখে তার শরীর কেঁপে উঠতে লাগল। নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে গেছে কিছুদিন আগে। রাত্রের বিছানা তাকে টানে। সত্যনাথকেও। অফিসের কাজে যখন বাইরে যায় সত্যনাথ ঘুম আসতে চায়না আঁখির। আদিনাথ প্রায় প্রায়ই দিল্লি যাতায়াত করেন। কিন্তু আশ্চর্য, কদাচিৎ নামেন কাশী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। আঁখির ধারণা, শাশুড়ী আগে থেকে ডেকে না পাঠালে শ্বশুর নামতে সাহস পান না।

এরমধ্যে নতুন ফিয়াট কিনেছে সত্যনাথ। পুরোনো অসটিনটা চলছিল

ভালই। শাশুড়ী একদা, ধর্মজীবনে প্রবেশের আগে, ওটা নাকি নিজেই ড্রাইভ করতেন। বিলেতে কেনা। আদিনাথ ইদানীং খুঁতখুঁত করছিলেন। "বউমা এসেছেন। ওটাকে পেনসন দে। নতুন গাড়ি কেন একটা। দরকার লাগে আমি টাকা দিচ্ছি।" সত্যনাথ, তার যা স্বভাব, মুচকি মুচকি হাসত। বলতনা কিছু।

গাড়ি যেদিন এল সেদিন অনেকরাত্রি গান বাজনা হল আঁখির ঘরে। বন্ধুরা সব এসেছিল সত্যনাথের। আঁখির তরফেও কেউ কেউ। অনেক রাতে বুকের মধ্যে ক্লান্ত আঁখিকে টেনে নিয়ে সত্যনাথ বাবার গলা নকল করে বলল: থ্যাংক ইউ।

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেশ দেরী হয়ে গেল আঁখির। সত্যনাথ কখন উঠে গেছে জানেও না। জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে ভরে গেছে- ঘর। একটা নীল মাছি রজনীগন্ধার উপর গিয়ে বসেছে। মাছিটাকে নয়, ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় তার ছায়া দেখতে পেল আঁখি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই কেন জানি মনে হল আঁখির, যে বাড়িতে সে রাত্রে ঘুমুতে গিয়েছিল, সেই বাড়িতে তার ঘুম ভাঙেনি। এটা যেন অন্য কারু ঘর। রাত্রের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটে গেছে কিছু।

তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। চানটান সেরে শোবার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল আঁখি। তার ঘরের ঠিক মাঝখানে এক অপরিচিত মহিলা। লালপাড় গরদের কাপড় পরনে। ঘন কালো লম্বা চুল বাঁধভাঙা বন্যার মত নেমে গেছে কাঁধ ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে। সাড়া পেয়েই বোধ করি ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন। রাজেন্দ্রাণীর মত চেহারা। কী রঙ, কী মুখের গড়ন, কী দেহসৌষ্ঠব। মা দুর্গা যেন এসে দাঁড়িয়েছেন। হাত মাত্র দুটো কেন ও'র?— আঁখি ভাবল।

সম্বিৎ ফিরে পেতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রণাম করলে আঁখি। 'কখন এলেন মা আপনি? কিছুই তো জানি না।'

চিবুক ছুঁয়ে হাতে চুমু খেলেন শাশুড়ী। সিঁথিতে পুরু সিঁদুর টানা, কপালে প্রকাণ্ড টিপ। তা থেকে বিন্দু বিন্দু সিঁদুর ঝরে পড়েছে নাকের উপর। শাশুড়ীর আগাগোড়া সব টিপটাপ। একরত্তি ময়লা লেগে নেই কোথাও। যেখানে যান চারপাশের আলো-বাতাসকেও যেন কনট্রোল করে ফেলেন। শুধু ওই টিপটাকে ঠিক বাগ মানাতে পারেন না।

আঁখি প্রথমটা শুনেছিল মাসখানেক থাকবেন তিনি। তারপর চলে যাবেন কেদারবদ্রী। কিন্তু রয়ে গেলেন তিন মাসেরও বেশী। প্রথম দু-হপ্তা বাড়িতে অষ্টপ্রহর ভিড়। কত ধরণের লোক। কেউ ক্যামবিসের জুতো পায়ে বাস-ট্রাম করে। কেউ বিরাট দামী সব গাড়ি হাঁকিয়ে। দক্ষিণী এক মহিলা এলেন হাজার টাকার কানজিভরম্ শাড়ি চাপিয়ে। যা গয়না সব হীরে বসানো। সব গুরুভাই গুরুবোন, অনুমান করে আঁখি। সবাই শাশুড়ীকে কেমন মানে, দেখে দেখে

অবাক হয় আঁখি। তেতালা সব সময় জমজমাট। দু-হপ্তা পরেই কিন্তু ভিড় একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। নিশ্চয় তাঁরই অনুজ্ঞায়।

আঁখিকে তাঁর বা তেতালার পূজাআচ্চার কোনো কাজ করতে দিলেন না শাশুড়ী। শুধু ষষ্ঠীর দিন আর পূর্ণিমা অমাবস্যায় মিছরির সরবৎ খেতেন, সেটা বানাবার ভার পেল আঁখি। ওইটুকু দায়িত্ব পেয়ে বর্তে গেল সে।

হঠাৎ সত্যনাথের বিলাত যাওয়া ঠিক হল। অফিস পাঠাচ্ছে ইংল্যানড কানাডা এক বছরের জন্য। আঁখিকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। অফিস রাজী নয়। কারণ তাকে থাকতে হবে ডিফেনস ইনস্‌টলেশনে। সেখানে আত্মীয়সঙ্গী রাখা যায় না।

শাশুড়ী বললেন, আঁখি ছ-মাস থাকুক বাপের বাড়ি। ছ-মাস চলুক আমার কাছে থাকবে।

মৃদু প্রতিবাদ করলেন আদিনাথ। একফোঁটা মেয়ে। তোমার ওই আশ্রম-ফাশ্রমে কী করে থাকবে!

শাশুড়ী বললেন, 'মেয়েদের জীবনে কত দুঃখ আসে তা তোমরা কী জানবে? ওকে আমি প্রস্তুত করে দিয়ে যেতে চাই।' শান্ত কণ্ঠেই কথা বলতেন তিনি, তিন্তু কী জোর ভিতরে ভিতরে। অমান্য করা অসম্ভব।

যাবার আগের দিন এলেন আঁখির গানের ঘরে। এই প্রথম। দু চোখ মেলে দেখলেন সব যন্ত্রটন্ত্র। দেয়ালের ছবি সমস্ত। তারপর বললেন, বউমা, আজ দুপুর বারটা থেকে আমি বাক্ সংযম করব। তার আগে জরুরী কথা সেরে নেই। আমার চোখের দিকে তাকাও। ঠিক করে বল। তোমার সব চেয়ে প্রিয় জিনিস কী?

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থেকে আঁখি বলল, গান।

'তবে তোমাকে ওই গান বন্ধ করে দিতে হবে। সত্যনাথ জন্মাবার পর থেকে এই সংসারের উপর একটা অভিশাপের খড়্গ ঝুলছে। এর চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু ছিল না, এই সংসার। স্বামী পুত্র সাচ্ছল্যের এই সংসার। গুরুদেব পথ নির্দেশ করলেন। আমি মেনে নিলাম। খুব কষ্ট পেয়েছি প্রথমে। বোকা ছিলাম তো। বাঁধন ছিড়তে বড় লেগেছিল। এখন জানি ঠিকই করেছিলাম। তুমিও গান তাঁর পায়ে সমর্পণ করে দাও। নইলে শান্তি নেই।'

বাজ পড়ে গেল আঁখির মাথায়। স্বামীকে সব খুলে বলল না আঁখি। শুধু জানালে মা গান বারণ করেছেন।

স্থির হয়ে শুনল সত্যনাথ। হুঁ হাঁ কিছুই করল না। ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্যও নয়। অভিমানে পাথর হয়ে গেল আঁখির বুক।

সত্যনাথ বিলেত উড়ে গেল জুলাই নাগাদ। সেপটেমবরের গোড়াতেই বাবা এসে নিয়ে গেলেন। আদিনাথের মাথা টিপে দিতে দিতে আঁখি বললে, আমি

এখন গেলে আপনার বড় কষ্ট হবে। শরীরটা আপনার ভাল যাচ্ছে না। আমি বরং সামনের মাসে যাব।

ব্যস্ত হয়ে আদিনাথ বললেন, না না, সে কী কথা। বেয়াই মশায়কে লিখে দিয়েছি। তুমি না গেলে ওঁরা দুঃখ পাবেন। আমার জন্য ওয়াির কোরো না· আই অ্যাম অ্যাজ হেলথি অ্যাজ ওয়ান কুড বি।

বাবা মার কাছে গিয়েও বেশী দিন থাকতে পারল না আঁখি। বাবা খালি হাত দেখে অবাক হলেন। তানপুরা নিবি না? দেশে গিয়ে আঁখি দেখল যাবার আগেই তবলা দুটো ছাইয়ে রাখা হয়েছে। টিউন করে আনা হয়েছে হারমোনিয়ম· বেচারা বাবা। সব শুনে মুহ্যমান হয়ে গেলেন।

গানের লোভে শহরের ছেলেমেয়েরা সব আসে আর ঘুরে যায়। কেন আঁখি গাইছে না, কেউ কিছু বোঝে না। এলেই দেখে গানের বদলে অ্যাসিস্-ট্যানট হেডমাসটারবাবুর বাড়িতে জোরসে চলছে তাস, আর ঝালমুড়ি পেঁয়াজির চাট।

যা হবার তাই হল। রটে গেল ছেলেপুলে হবে আঁখির। তাই গান গাইছে না সে। মা রাগ করে বললেন, যদি সেটাও হত বাঁচা যেত।

পুজো চুকতেই শাশুড়ীর কাছে চলে এল আঁখি। আবার সেই কাশী। কিন্তু এবার আর গান না। তবে কী? কান্না?

আশ্রমের অতিথিশালায় তিনরাত থেকে বাবা চোখের জল ফেলে চলে গেলেন। বলে গেলেন, তোকে নির্বাসনে রেখে গেলাম।

নির্বাসনই বটে। ভাবলে আজও বুক ফেটে যায় আঁখির। তার জীবনে এক বছরে কত ওলটপালট হয়ে গেল। কোথায় গেল সব পরিচিত মানুষেরা? কোথায় রইল স্বামী শ্বশুর? তাদের সঙ্গে তবু একটা সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু শাশুড়ী?

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে বাড়িটা পুরোনো, কিন্তু বড় সুন্দর। সব সময় মা গঙ্গার স্নেহস্পর্শ তার গায়ে। কাছেই অহল্যাবাঈ ঘাট নেমে গেছে জলের দিকে। মূল আশ্রম সেই শিবালার দিকে। শাশুড়ী থাকেন এখানটাতেই! একলাই থাকেন অত বড় বাড়িতে। ভয় ডর কিছু নেই। এখন আঁখি সঙ্গী। আশ্রম থেকে দুবেলা খাবার আসে। শাশুড়ী একবেলা খান। সামান্য মাত্র। আদেশ করে করে আঁখিকে খাওয়ান।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখেছে আঁখি। চাঁদের আলো খোলা জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। বিছানার উপর স্থির বসে তিনি। বন্ধ দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখে কিন্তু অনির্বচনীয় আনন্দের চিহ্ন। খাড়া বসে আছেন। যেন অমলিন নিষ্কম্প প্রদীপ শিখা। চোখ ফেরাতে পারে না আঁখি। মানুষ এত সুন্দর হয়?

রাত তিনটে থেকেই সাধুরা স্নান করতে নামেন গঙ্গায়। তাঁদের খড়মের শব্দ পাথরের সিঁড়ির উপর। ওই আওয়াজ পর্যন্তই। তাঁদের কিন্তু দেখা যায় না। আঁখি বসে বসে শোনে। আওয়াজ চলে যাচ্ছে জল পর্যন্ত। তারপর জল তোলপাড় করছেন কারা সব। আবার এক সময় শব্দ উঠে আসে সিঁড়ি বেয়ে। জানলার পাশ দিয়ে চলে যায়। অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ। ঘি-এলাচ-ধূপ মেশানো এক অদ্ভুত গন্ধ পাঁপড়ি মেলতে মেলতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সকাল হয়ে আসে। জেগে উঠে, দৃশ্যমান হয় পরিচিত পৃথিবী।

মনের মধ্যে ভার জমতে জমতে পাগল হয়ে যায় আঁখি। সইতে পারে না আর। গভীর রাতে ধ্যানে বসেছেন শাশুড়ী। দরজা খুলে ঘাটে নেমে গেল আঁখি। কী করছে যেন খেয়াল নেই। বুক জলে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে সেই তারায় জ্বলা আকাশ। নদীর ওপাশে শাদা কংকালের মত চড়া। রামনগরের দিক থেকে হাওয়া বইছে হু হু। ঠাণ্ডা জল কেটে কেটে গায়ে বসে যাচ্ছে। আঁখি শরীরটাকে প্রায় ছেড়ে দেবে এমন সময় ঘাট থেকে গুরুগম্ভীর গলায় কে বলে উঠল: অ্যায়সা কাম না করো মায়ী। ঘর যা মায়ী, ঘর যা।

ঘাটে উঠে দেখে এক জোড়া খড়ম পড়ে আছে। কেউ কোথাও নেই তো।

পরদিন ঘুম ভাঙল শাশুড়ীর চোখে চোখ রেখে। অপরূপ মমতাময় দু চোখ তাঁর। বললেন: হ্যাঁরে, আত্মঘাতী হবি কোন্ দুঃখ এড়াতে? দুঃখ কেউ কাটাতে পারে না। দুঃখের উপরে উঠে যা।

সেদিন থেকে আঁখিকে ভার দিলেন একটা। 'রোজ আশ্রমে যাবি আমার সঙ্গে, গুরুদেবকে গান শুনিয়ে আসবি। অন্য গান নয়। ভজন গাইবি শুধু।'

অবাক আঁখি সেদিন আবিষ্কার করল, গুরুদেবকে গান শোনানো মানে তাঁর ছবিকে গান শোনানো। তিনি স্থূলদেহে নেই আজ বছর ছয়েক। অথচ সবাই এমন ভাবে কথা বলে যেন তিনি মর্তেই আছেন। কিন্তু নেই-ই যদি তবে আবার নির্দেশ পাঠান কী ভাবে? আঁখির হঠাৎ মনে পড়ল ফাঁকা সেই ঘাটে পড়ে থাকা খড়ম জোড়া! চুপ করে রইল।

সত্যনাথ ফেরবার আগেই কলকাতা চলে এল আঁখি। আবার সেই জীবন। কিন্তু ঠিক সেই জীবনও নয়। গানের ঘরে বসে না আঁখি। গানের কথা ভুলে গেছে সত্যনাথ। আদিনাথ আছেন ব্রিফ নিয়ে ব্যস্ত মানুষ।

সেদিনটা আঁখির খুব স্পষ্ট মনে আছে। বাবা সারারাত্রি গান শুনে ভোরবেলা চলে এলেন মেয়ের বাড়ি। আদিনাথ উচ্ছ্বসিত। মক্কেলদের সব ভাগিয়ে দিয়ে এসে বসলেন তাঁর কাছে। অদ্ভুত একটা সখ্য জন্মেছিল দুই বেয়াইয়ের মধ্যে। মেয়ের গান বন্ধ। সেই ক্ষোভও বাবা যেন ভুলে যেতেন আদিনাথ এসে সম্ভাষণ করলে। সালামত নাজাকতের গোরখকল্যাণ শুনে এসেছেন বাবা। সেই গল্প করছিলেন। আঁখি কফি আনতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে

আবার ধপ করে বসে পড়ল। দুই বাবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কী হল? আরক্ত মুখ নামিয়ে আঁখি বলল, কিছু না। একটু বাদে ঘরে এসে সত্যনাথের কোলে বসে পড়ল। বিস্মিত সত্যনাথ হেসে বললে, হঠাৎ আদর খাবার শখ কেন খুকীর মার? আঁখি বললে, খুকী নয় গো, খোকা। খোকাই হবে। আজ পেটের ভিতর নড়ে উঠেছিল, জান?

জীবন চলে যায়। এক বছর, দু বছর, তিন বছর। ছেলে শংখ হাঁটতে শিখল। কথা বলল। আদিনাথের কোলে চড়ে বড় রাস্তা বেড়াতে গেল। সাহেব আদিনাথের ওই রূপ দেখে সবাই বিস্মিত।

শাশুড়ি আর এলেন না। এমন কি সত্যনাথের অত বড় অসুখের মধ্যেও না। স্বামীকে তিল তিল করে শেষ হয়ে যেতে দেখল আঁখি। একটা সোনালি বিকেলে বারান্দায় ডেকচেয়ারে আধশোয়া বসে নীচে বাগানে শংখকে খেলা করতে দেখছিল স্বামী-স্ত্রী। সত্যনাথ বললে, বিদেশে যেখানে গেছি দেখেছি ডাক্তাররা বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ করছে ক্যানসারের ওষুধ বের করবার জন্য। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচা হচ্ছে। ওরা বের করে ছাড়বেই একদিন। কিন্তু দ্যাট উড বি টু লেট ফর আস। আমি তখন কোথায়?

আঁখি ইদানীং আর কাঁদত না। সত্যনাথের সামনে তো নয়ই। স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল নিঃশব্দে। সত্যনাথ আবার বললে: আমি জানি তুমি মায়ের কাছে থেকে অনেক জোর নিয়ে ফিরেছ। ওইটুকুতেই আমি নিশ্চিন্ত। শংখকে নিয়েও দুশ্চিন্তা করি না। তুমিই তো আছ। ও মানুষ হবেই। তুমি মাকে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আমাদের সবার কল্যাণ খুঁজতে গিয়েই উনি নিজেকে বঞ্চিত রাখলেন। উনি ঠিক করেছেন, না ভুল, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি জানি, আমি একটা বড় ভুল করেছি। অবিচার করেছি তোমার উপর। তার সংশোধন চাই। এখন আমার নির্দেশ শোনো। (একটু হেসে) স্বামীর হুকুম শোনো। আজ সন্ধ্যে থেকেই তুমি গানের ঘরে যাবে। তোমার উস্তাদ তো এখন পাকাপাকি কলকাতায়। যেদিন একটু সময় পাবে যাবে তাঁর কাছে। মার জন্য ভেবো না। আমি কাল ওঁকে লিখে দিয়েছি।

সেই বারান্দাতেই কত রাত একলা বসে কাটিয়েছে আঁখি। খোলা জানলা দিয়ে দেখেছে বিছানায় ঘুমুচ্ছে শংখ। সেই বাচ্চা শংখ বড় হল। চলে গেল লনডন ফ্যারাডে হাউসে পড়তে। ফিরে এসে আবার চাকরি নিয়ে আমেরিকা। একবারও বাধা দিল না আঁখি। ছেলে কি আঁচলের তলে লুকিয়ে রাখার বস্তু। প্রতিটি মানুষ একটা টাটকা তাজা চলন্ত গাছ। আলো হাওয়ার অবাধ অধিকার নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। তার কাজ তাকে করতে দাও। কাউকে বেঁধে রেখো না। ছেড়ে দাও খোলা আকাশের নীচে। যেখানেই থাকুক, ভাল থাকুক শংখ। সুখে থাকুক। যতদিন আয়ু, পুরোপুরি জীবন উপভোগ করে নিক।

সারা জীবন গান নিয়ে থেকে ওইটুকু অন্তত বুঝেছে আঁখি। সুরতাললয়ে বাঁধা গানের সর্ব সার্থকতা মুক্তিতে। বড় শিল্পী হাজার বাঁধনে গানকে বাঁধবেন, অনায়াসে তাকে অবারিত করে দিতে পারবেন বলেই। ব্যালানস বা কনট্রোলের চেয়ে বড় কথা হল এলিভেশন। কিন্তু একটা ছেড়ে আরেকটা না। তার জীবনের বড় অংশই হিমশিলার মত দুঃখের গভীরে। একটুখানি মাত্র উপরে জেগে থেকে সুখের স্বপ্ন দেখছে।

টংটং করে পেটা ঘড়িতে চারটে বাজল। মোটে চারটে?' মনে হচ্ছে যুগযুগান্ত আঁখি জানলার পাশে বিছানায় বসে আছে। বর্তমানের চেয়ে অতীতকে কেন বেশী জীবন্ত মনে হয়?

আঁখি হাসল। গায়িকা হিসাবে কিছু স্বীকৃতি আজ সে পেয়েছে। বড় বড় সব কনফারেনসে আজ তার ডাক পড়ে। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করেছে রেডিওতে। কালচারাল ডেলিগেশনে গিয়ে ঘুরে এসেছে রাশিয়া পূর্ব ইয়োরোপ। দিল্লিতে শুনেছে সামনেরবার সরকারী খেতাব জুটবে তার কপালে। কিন্তু এই সবই কি চেয়ে এসেছে জীবনভর? বাবা তার খ্যাতির অনেকটাই দেখে গেছেন। তিনি কি তৃপ্তি নিয়ে যেতে পেরেছেন? বাবা, তোমার আঁখি কি ঠিক ঠিক রাস্তা ধরে চলেছে?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আঁখি দোতলা থেকে। একতলার সব ঘর বন্ধ। গেট খুলে বাগানে গিয়ে দাঁড়াল। কী সুন্দর এই ভোর হওয়া। জুতো খসিয়ে ফেলে দিলে দূরে। ভেজা ঘাস মায়ের হাতের ছোঁয়া যেন। ইচ্ছে হল দু হাত দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীটাকে জড়িয়ে ধরে। যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে। হে করতার, পুরি কর মন কি ইনছা।

অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা একবার সদর গেটের কাছে যাচ্ছে, আবার ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে ঘুরে আসছে। আবার যাচ্ছে, শুঁকছে। শিকের ফাঁক দিয়ে নাক বের করে দিচ্ছে। বন্ধ গেটের বাইরে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ও কে বসে? চেনা চেহারা।

গেট খোলার আওয়াজে চমকে উঠে দাঁড়াল মূর্তিটা। সামনে আঁখিকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললে, ফরগিভ মি আনটি, প্লিজ ফরগিভ মি।

সুমন? তুই? এভাবে বাইরে কেন রে? আয় ভিতরে আয়।

বিবর্ণ, অজানা ভয়ে সর্ব শরীর থরথরিয়ে কাঁপা সুমনকে নিয়ে আঁখি আবার দোতলায় উঠে গেল। পরম স্নেহে ধুইয়ে দিল হাত-পায়ের ময়লা। কামপোজ, ব্র্যানডি মেশানো গরম দুধ, খাইয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। বললে, বুঝেছি সব কথা। এখন আর কথা বলিস না। নিশ্চিন্তে ঘুমো। আমি তো আছি, ভয় কী তোর?

অনেক বেলায় প্রথম ফোনটা যখন এল, দূরভাষী দুঃসংবাদ আঁখিকে পাথর করে দিয়ে গেল, তখনও সুমন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তারপরই ফোনটা পাগলা হয়ে বাজতে লাগল, ক্রমাগত বাজতে লাগল।

চেয়ারে বসে সুমনকে পাহারা দিতে লাগল আঁখি। ভাইয়া, তুমি এমন করে চলে গেলে?

এক
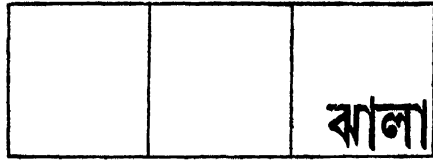
রমেনকে যখনই সুধীশ দেখে, তাজ্জব বনে যায়। তাকে দেখে অজানা মানুষ কেউ কখনো সন্দেহমাত্র করতে পারবে না যে, এই পানজর্দাখোর, বাক্যবাগীশ, ময়লা ধুতির উপর সদ্যভাঁজভাঙগা পানজাবিপরা লোকটা হল কলকাতা শহরের সবচেয়ে নামী মিউজিক কনফারেনস-এর সর্বময় কর্তা। ডেজিগনেশনে রমেন মাত্রই ট্রেজারার। প্রেসিডেনট আছেন, চারজন ভাইস প্রেসিডেনট আছেন, জয়েনট জেনারেল সেক্রেটারী দুজন, সেক্রেটারী, অ্যাসিস-ট্যানট সেক্রেটারী, চেয়ারম্যান অব আরটিসটস সিলেকশন কমিটি, চেয়ারম্যান রিসেপশন কমিটি সবাই আছেন। সবাই কেষ্টবিষ্টু। হয় হোমরাচোমরা অফিসার সব। নয়তো লক্ষপতি ব্যবসায়ী। অথবা সেই সব অভিজাত পরিবারের উত্তরাধি-কারী যাদের পূর্বপুরুষ বেড়ালের বিয়ে দিতেন, তয়ফাওয়ালিকে আতরে চান করিয়ে সভায় নাচাতেন গাওয়াতেন। কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যরাও সব কেউকেটা। কেউ হাজার পাঁচেক টাকার সলিড বিজ্ঞাপন এনে দেন, কেউ মোটা ডোনেশন, কেউ কাগজে কাগজে অন্তত দু-কলম হেডলাইন দেওয়া পাবলিসিটির প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। আর পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, গোটা চার ছয় সিনিয়র জুনিয়র মন্ত্রী, বাঘা ব্যারিসটার, অবসরপ্রাপ্ত চিফ জাসটিস প্রভৃতির সঙ্গে আছেন মন্মথ ঘোষ, লালাবাবু, রাইচাঁদ বড়াল ইত্যাদি সংগীত জগতের দিক্‌পাল। এলাহী কাণ্ড যাকে বলে। কিন্তু এতসবের মধ্যেও রমেনই হল আসল লোক। প্রাইম মুভার। মধ্যমণি। তাকে ছাড়া নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত মহাসম্মেলন একদম, একদম অচল।

সুধীশ আজও বুঝে উঠতে পারেনি রমেনদা কেন তাকে কমিটিতে রেখেছে। গত তিন বছর ধরে সুধীশ কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। অ্যাসিসট্যানট সেক্রেটারী। সম্মেলনের আগে যে ওয়ার্কিং কমিটি মাত্র জনাছয়েক লোককে নিয়ে গঠিত হয় তাতেও সুধীশকে থাকতে হয়। তার দায়িত্ব সম্মেলন চলা কালে স্টেজ দেখাশোনা করা। যা যা যন্ত্রপাতি দরকার সংগ্রহ করে রাখা।

ঠিক ঠিক মত প্রোগ্রাম চালু করে দিয়ে পরের শিল্পীকে তাগাদা দিয়ে আসা। সুধীশ হুকুম দিলে তবে মঞ্চের পর্দা উঠবে পড়বে। আর কারও কথায় কান দিতে না করা আছে স্টেজ হ্যানডদের।

অবশ্য সুধীশ একলা নয়। তাকে সাহায্য করবার জন্য জনাছয়েক ভলান-টিয়ার থাকে। প্রোগ্রাম অ্যানাউনস করেন জয়েনট জেনারেল সেক্রেটারি মিসেস রঙ্গনাথন। মিষ্টি গলা। পরিষ্কার সুন্দর উচ্চারণ। বাংলা ইংরাজি কোনোটাতেই বাজে টান নেই। মানুষটা দেখতে যেমন—স্বভাবেও—চমৎকার। শিল্পীরা যাতে ঠিক মত চা জলখাবার পান সেটা দেখাও তাঁর কাজ। কোন্ শিল্পী গাইতে বসে গরম জল আদাকুচি চেয়ে ফেলতে পারেন তাও তিনি জানেন।

মিসেস রঙ্গনাথনের সঙ্গে আর একজন সেক্রেটারী হলেন নলিনী রায়। একটা ছাপাখানার মালিক। তাঁর ওখান থেকেই বের হয় কনফারেনস স্যুভেনির। বিজ্ঞাপনের ম্যাটার, আরটিসটদের ছবি ও জীবনী, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, শিক্ষামন্ত্রী, উপজাতীয় মন্ত্রীর বাণী, আর যত হাবিজাবি যা আসে রমেন সটান পাঠিয়ে দেয় নলিনীবাবুর কাছে। প্রতিবারই নলিনীবাবু বলেন রমেন ভায়া, এবার কিন্তু আর শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত বিজ্ঞাপন পাঠিও না। বড় ঝামেলা হয়। প্রেস পেরে ওঠে না। ওভারটাইম গুণে এ বাজারে আর পোষায় না।

হাত জোড় করে রমেন বলে, 'না দাদা, এবার দেখবেন আমি খুব স্ট্রিক্‌ট হব। ১৫ তারিখ ডেডলাইন। তারপর আর একটি বিজ্ঞাপনও যাবে না। তা সে এয়ার ইনডিয়ার অ্যাড-ই হোক, আর ইসটারন রেলই হোক। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী রিকোয়েসট করলেও গলব না।' নলিনীবাবু বলেন, 'হ্যাঁ ভাই, তাই ভাল। নইলে বড্ড বিপদে পড়ে যাই।'

সবই কথার কথা। শেষ পর্যন্ত টেলিফোনে নলিনীবাবু চেল্লাতে থাকেন। রমেন আরও জোরে চেঁচায়। 'বিজ্ঞাপন নেবেন না মানে? কনফারেনসটা নামবে কী করে? কার বাপের ইয়েতে তেল দিতে যাব আমি অ্যাঁ? বলি টাকাটা আসবে কার ইয়ে ছিড়ে?'

ওই এক দোষ রমেনের। বড্ড মুখ খারাপ করা স্বভাব। রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান, টাকার কুমীর অবনী পাল হলেন প্রতিপক্ষ। মিসেস রঙ্গনাথন বলেন লিডার অব দি অপজিশন। রমেন উত্তরে গেলে উনি যেতে চান দক্ষিণে। অবনী পাল বলেন রমেন হারামজাদার মুখতো নয়। বর্ষার খাটাল। সর্বক্ষণ বদ্‌গন্ধ ছাড়ছে।

স্বর নামিয়ে নলিনীবাবু বলেন, 'কিন্তু তা বলে তুমি চিতেয় ওঠা পর্যন্ত বিজ্ঞাপন অ্যাকসেপট করে যাবে। ব্যাপারটা কী? ওপনিং ডে-তে তাহলে বই ছাড়ব কেমন করে?'

রমেন হঠাৎ যেন হার স্বীকার করে নেয়। 'ঠিক আছে দাদা। এই পাঁচটা ফুল পেজ আর দুটো হাফ পেজী বিজ্ঞাপন আজ এসেছে। প্রেসিডেনট পাঠিয়েছেন দুটো। আর বাকিটা এনেছেন পটলবাবু আর ইউসুফ। এখন তাহলে আপনিই ডিসিশন নিন কী করা যায়। হাজার হলেও আপনিই তো জয়েনট সেক্রেটারী। আমি তো ট্রেজারার মাত্র। আয় ব্যয়ের হিসাব রাখাই আমার কাজ। আমি শুধু পয়েনট আউট করতে চাই যে তিনশ ইনটু পাঁচ হল গিয়ে পনেরশ। আর দুটো হাফে হল দুশো দুশো চারশ। সব মিলিয়ে উনিশশ টাকা। তার মানে ওর সঙ্গে আর কিছু অ্যাড করলেই ধরুন শরাফতের দক্ষিণাটা উঠে যায়।'

নলিনীবাবু বলেন, 'আহা, সে কথা নয় ভাই। আমি কি বুঝি না? তবে'—

মিঠে করে রমেন বলে: 'কিন্তু দাদা, আপনি হানড্রেড পারসেনট রাইট। প্রিনসিপল বলে কথা। আপনি স্ট্রং হয়ে থাকুন। দেখুন আপনার লিডরশিপে আমরা আমাদের ব্যানার কোথায় নিয়ে যাই।'

ফোন রেখে দিয়ে রমেন বলে, 'বাপ্তোৎ, ছাপবে না। বাপ ছাপবে ওর। নইলে দেখুক না মিটিং-এ আমি কী করি।'

সুধীশ জানে শেষ দিন পর্যন্ত বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে এবং যতই লপ্চান নলিনীবাবু, তাঁকেও ছাপাতেই হবে। ওপনিং নাইটে তাড়াহুড়ো করে মাত্র গুটিকয় স্যুভেনিরের কপি দফতরীর কাছ থেকে বেঁধে আনা হবে। নলিনী-বাবুই হন্তদন্ত হয়ে ব্যাগে পুরে সেগুলি নিয়ে আসবেন। ফাংশন শুরু করিয়ে দিয়ে গেটের কাছে ফুঁফু করে সিগারেট টেনে যাবে রমেন। নলিনীবাবুর পুরোনো ভকসল গাড়িটা এসে দাঁড়ানো মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাগটা প্রায় কেড়ে নেবে। তারপর বগলে চেপে যেন সুইয়জ বা অ্যাপেলোর গোপন নক্শা নিয়ে যাচ্ছে এমনি সতর্কতার সঙ্গে হল্-এ গিয়ে ঢুকবে। টিপে টিপে মূল্যবান কপিগুলো তুলে দেবে প্রেসিডেনট পেট্রন এবং ভি-আই-পি গেস্টদের হাতে। নাছোড়বান্দা শ্রোতারা যদি উঠে এসে কিনতে চায়, তৎক্ষণাৎ ভলান-টিয়াররা ছুটে এসে বলবে, বাইরে যান কিনতে পাবেন। বাইরের ভলানটিয়াররা বলবে, মাত্র গোটাকয় কপি এসেছে। বাকিগুলো এই এলো বলে। এমনি করে ঘণ্টা দুই কাণামাছি খেলার পর নতুন ঘোষণা শোনা যাবে, আজ যে-কটা এসেছিল সব বিক্রী হয়ে গেছে। কাল পাবেন।

পরদিন আরও একশ হয়তো আসবে সদ্য বাঁধাই হয়ে। তার পরদিন বাদবাকি সব। কেউ মিলিয়ে দেখে না। নইলে দেখত অন্তত গোটাকয় বিজ্ঞাপন রোজ বেড়ে গেছে। রহস্যটা বিজ্ঞাপনদাতারাও যে অনুমান করতে পারেন না তা নয়। তবে তাঁরা জানেন, এই বিজ্ঞাপনে যতটা প্রচার, তার চেয়ে বেশী হল পাবলিক রিলেশনস। টাকাটা উশুল হয় অন্যভাবে।

খেলাটা সুধীশ জানে। কিন্তু এক হিসাবে রমেনদা রাইট। এই তো, মহাসম্মেলনের বাজেট হল ষাট হাজার টাকা। হল্ চারজ, পাবলিসিটি, শিল্পীদের ফি, টিকিট ছাপানো, ট্যাকস-ম্যাকস সব নিয়ে পাঁচদিনের জলসায় রোজ যদি হাউস ফুল যায় পনের যোল হাজারের বেশী হাতে আসবে না। সব টিকিট বিক্রী করা যায় না। রবীন্দ্রসদন হলে কর্তৃপক্ষকে ছাড়তে হবে বাইশ-তেইশ খানা সীট। কলামন্দিরে চোদ্দখানা। তাছাড়া মেমবাররা, মিউজিক ক্রিটিকরা আছেন। বিশেষ অতিথিবৃন্দ, পুলিশ, বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য আসন রাখতে হয়। সব মিলিয়ে রোজ শ দেড়েট সীট কমপক্ষে ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলে ওই ষাট মাইনাস পনের অর্থাৎ হাজার চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা আসে কোত্থেকে? কিছু ডোনেশন ওঠে। বাদবাকি সব আসে ওই বিজ্ঞাপন থেকে। সম্মেলনের স্যুভেনিরগুলো হল উচ্চাংগ সংগীত সমাবেশের প্রাণভোমরা। ওই বিজ্ঞাপন-রাজস্ব বন্ধ হলেই পটাপট সব কনফারেনস মরে যাবে।

বুঝলে হে, রমেন বলে, আগে আমাদের গান কনট্রোল করতেন রাজা গজা আমীর বাদশা জমিদাররা। এখন ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীতের মুরুব্বী হল কোল, স্টিল আর টোবাকো এই তিনটে শিল্প। যে কোনো স্যুভেনির উলটে দ্যাখ। আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে যাবে।

সেক্রেটারী সমীর মল্লিক বনেদী বাড়ির ছেলে। পাকা আমটির মত গায়ের রঙ। রমণীমোহন চেহারা। রমেনের সংগে একদা স্কটিশ কলেজিয়েট স্কুলে পড়েছে। সেদিন পর্যন্ত ঘাড় চেঁচে চোদ্দ আনা-দু আনা ছাঁট দিয়ে ঘুরে বেড়াত। একসপোরট ইমপোরটের গ্যাড়াকলে নেমে আচমকা একবার আমেরিকা ছুঁয়ে এসে এখন দুর্দান্ত আধুনিক। চুলে তার বেণী বাঁধা যায়। জুলফি ইয়া বড়। চোংগা প্যানট আর বিচিত্র কাটের রঙবেরঙা শারট। সমীর সংগ্রহ করে তামাক কোমপানীর ঢালাও বিজ্ঞাপন। দারুণ উৎসাহী। কিন্তু মদ খেয়ে হল্-এ এসে ছিমছাম মেয়ে দেখলেই হাত্তাবাজীর ধান্দায় থাকে। একবার তো এক করনেলের বউ ক্ষেপে গিয়ে জুতো খুলে পটাং পটাং। বিশ্রী কান্ড একেবারে। অনেক সদস্য জেনারেল মিটিং-এ অভিযোগ তুললেন নাম খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাটাকে তাড়াও। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রমেন তাদের থামায়। সর্বনাশ। সমীর যাওয়া মানে কম সে কম হাজার ছ-সাত টাকা মাইনাস। পরের বছর থেকে সমীরের ডিউটি হল গাড়ি করে শিল্পীদের হল্-এ নিয়ে আসা, আবার প্রোগ্রাম শেষে পৌঁছে দেওয়া। বাড়ি থেকে তুলে আনা আমজাদ, হালিম জাফর বা কুমারনাথকে। হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া বিলায়েৎ বা নির্মলা দেবীকে। ডিউটি অ্যালটমেনট হওয়া থেকে মুখ আষাঢ়ে করে রেখেছিল সমীর। দুটো চালু মেয়েকে তার অ্যাসিসট্যানট হিসাবে দিয়ে তার মুখে হাসি ফুটিয়ে

ছেড়েছে রমেন।

স্টিলের বিজ্ঞাপন আসে মিসেস রঙ্গনাথনের দৌলতে। বলা উচিত তাঁর কর্তার দৌলতে। মিঃ রঙ্গনাথন হাসলে ইসপাতের বড় সেজ ছোট ডিসট্রিবিউ-টাররা সব নিশ্চিন্ত মনে দানাপানিতে মুখ দেয়। তিনি কটমটিয়ে চাইলে কলকাতা-বোমবাই-কানপুর-দিললির সব কটা দালালের প্রসববেদনা উঠে যায়।

রঙ্গনাথন ফোন তুলে বলেন: দোসানি, তুমি এবার চার হাজার দেবে। তুলসিয়ান, তুমি লাসট ইয়ার আমার মুখ হাসিয়েছ। এবার কমপেনসেট করে দেওয়া চাই। দত্তবাবু, তুমি দুই কালেকট করে দেবে। ইত্যাদি।

মিসেস রঙ্গনাথনের হাতে কনট্রাকট ফরমের সঙ্গে চেক চলে আসতে থাকে। ফোনে তিনি বলেন, রমেনবাবু, গুড নিউজ। আমার টেন থাউজেনডের কোটা আজ পূর্ণ হল। চেকগুলো সব ব্যাংকে পাঠিয়ে দেবেন।

রমেন বিগলিত গলায় বলে, সত্যি মিসেস রঙ্গনাথন, আপনার জবাব নেই। আপনিই তো সংস্থার বলভরসা। আপনি না হলে—

ফোন রেখে বলে: বীচ্।

কয়লায় জ্ঞাতগুষ্টির বিজ্ঞাপন ধরে দেন প্রতাপ সিং। ঝরিয়া ধানবাদ কুলটি আসানসোলের দিকে প্রতাপ সিং পানজাবীর দুর্দান্ত ইনফ্লুয়েনস। সদাসর্বদা ফিকে সবুজ পাগড়ী মাথায়। নেট দিয়ে সযত্নে বাঁধা। গাড়ির ড্যাশবোরডে বিলাতী মদের অফুরান স্টক। স্পিডে গাড়ি হাঁকাচ্ছেন জি টি রোড দিয়ে। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরা। অন্য হাতে শিভাস রিগালের গ্লাস। এই হলেন প্রতাপ সিং। পাঁচ থেকে সাত-আট-নয় হাজার পর্যন্ত তাঁর, রমেনের ভাষায়, মালকড়ির দৌড়। রমেনের সঙ্গে বিচিত্র বন্ধুত্ব তার, অন্ধকারের গভীরে সেই বন্ধুতার শিকড়। দেখা হতেই রমেন বলে: কী রে শালা পাঁইয়া, বেঁচে আছিস? প্রতাপ সিং বলেন, হ্যালো সোয়াইন। প্রতাপ সিং মাথা নীচু করেন দু জায়গায়। গুরুদ্বারে। এবং সরোদিয়া কুমারনাথ কপিলের কাছে। কুমার তাঁর হিরো। এবং সবাই বলে, মিসেস রঙ্গনাথন এবং প্রতাপ সিং আছে বলেই রমেন প্রতি বছর কুমারকে বুক করে।

• পাবলিসিটির ভারপ্রাপ্ত একসিকিউটিভ হলেন নন্দ মিত্তির। ইংরাজি কাগজের সাব এডিটার। চেহারায় বিষম শান্ত ভালমানুষ, দেখলে মনে হবে এইমাত্র পুজোআচ্চা সেরে গরীবদুঃখীকে দানধ্যান করে দুটো ফলমূল মুখে দিয়ে এলেন। আহা, একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে ওঁর বসার ঠাঁই করে দাও। মিউজিক ক্রিটিকরা সবাই ওঁকে দাদা বলে। কনফারেনস চলাকালে এবং রিভিউ না বেরুনো পর্যন্ত তাদেরও নন্দ দাদা বলেন। কে কোকাকোলা খাবে, কে অরেনজ, কে কাজুবাদাম, এবং কে বোতল চালাবে—সব কিছুর নিপুণ ব্যবস্থা নন্দ মিত্তিরের। ছোকরা-ক্রিটিক হলে স্নেহভাজন উঠতি শিল্পী মেয়েদের চুপি

চুপি পরামর্শ দেন: একটু কাছে গিয়ে বোসোটোসো। মুচকি হাসি, একটু ঢলে পড়া, এগুলো আজকালকার মেয়েদের আবার শেখাতে হয় নাকি? দু লাইন বাজে কথা লিখে দিলে তো কেরিয়ার ফিনিশ। রমেন আর নেবে ভেবেছ?

পছন্দের শিল্পীকে গাল দিলে বা সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ধরলে নন্দ সেই ক্রিটিকের ওপর খড়্গহস্ত। বলে, আর কনফারেনস কোরো না হে রমেন। কার জন্য করা? সব ব্যাটা অকৃতজ্ঞ। আর যদি বা কর, ওই উদোগুলোকে আর ডেকো না। গলা দিয়ে একটা শুদ্ধ নোট বের করতে তো হেগে ফেলবে সবকটা। অথচ লপচপানি দেখ।

দলের মধ্যে নন্দ রমেনের নিজস্ব ঘরানার লোক। দুজনেরই এই লাইনে তালিম মুরারি সেনের কাছে। গুরু মুরারি সেন। পেটে বোমা মারলেও সা বেরুবে না। কিন্তু কলকাতায় পাবলিক কনফারেনস কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছে ওই মুরারি। একই দিনে রাতে ফৈয়াজ, বড়ে গোলাম, কেশরবাঈ, পালুসকর, রবিশংকর, বিলায়েৎ, হাফিজ আলি মইনুদ্দিন-আমিনুদ্দিন, মণ্টু বাঁড়ুজ্যেকে প্রেজেনট করেছে ওই মুরারি। হ্যাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ-কেও। অসুস্থতার জন্য তিনি দু রাত পরে আলি আকবরকে নিয়ে বসেন। আমীর খাঁ, করিমুদ্দিন, তখন উঠ্‌তি যুবাপুরুষ।

সেই মুরারি নিভে গেছে। গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়ি ছেড়ে নড়তে দেখে না কেউ। বাড়ির সামনে সদাসর্বদা গোয়েন্দা পুলিশের পাহারা। এক সঙ্গে কতগুলো মামলা চলছে মুরারির নামে বলার নয়। গোটাকয় বিচ্ছু উকিল লড়ে যাচ্ছে তার হয়ে। ডেটের পরে ডেট। হাকিমের সামনে উকিলবাবুরা করুণ কণ্ঠে বলেন, আমাদের মক্কেলের হুজুর এখন-তখন। এই দেখুন সব ডাক্তার সার্জেনদের চিঠি। বাড়ি থেকে বেরুলে উনি বাঁচবেন না স্যর।

সত্যি তাই। গোয়েন্দা পুলিশরা দেখে সাত সাড়ে সাত হলেই সব বাতি নিভে যায় মুরারির বাড়িতে। শুধু দোতলায় রুগীর ঘরে কম পাওয়ারের সবুজ বাতি একটা টিমটিম করে জ্বলে। কোলাপ্‌সিবল গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মুরারির লাল ট্যালবট গাড়িটা ধুলোর চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কতকাল তার দলাইমলাই হয়নি। হর্ণ বাজিয়ে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় আর দশটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।

আশ্চর্য। নিশাচর মুরারি স্বভাবটাও পালটে ফেলেছে। নিশ্চিন্তে সকাল সকাল শুতে যাচ্ছে। ভোর ভোর উঠেছে। দোতলার বারান্দা থেকে সূর্যপ্রণাম করে মাঝে মাঝে। পাড়ার লোক দেখে বলে সেন সাহেবের শরীরটা আজ ভালই আছে।

রমেন আর ঘনিষ্ঠতম দু-চারজন মাত্র জানে, মুরারি সেন ঘরে বন্দী থাকে না। প্রায় প্রায়ই বেরিয়ে যায়। ছাদ থেকে পাশের বাড়ি। সেখান থেকে বেড়াল-

চলা গলি দিয়ে টিপু সুলতান পরিবারের কবরখানায়। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে এসে ট্যাকসি চেপে উত্তর কলকাতায় তার মেয়েমানুষ কুমুদের কাছে। মুরারিকে আটকাবে যে সে আজও মায়ের গর্ভ ছেড়ে বেরোয়নি।

আর সবাইকে সামনে বা আড়ালে গাল দেয় রমেন। শুধু মুরারি ছাড়া।

সুধীশ গল্প শুনেছে, রমেন যখন নিতান্ত বাচ্চা, হাফপ্যানট পরে, জুনিয়র ভলানটিয়ার মাত্র, তখন একবার বিষম অবাধ্যতা করেছিল। এজন্য কঠিন শাস্তি দিয়েছিল মুরারি। তার প্যানট খুলে নিয়ে সবার সামনে তাকে চরম বেইজ্জতি করে ছেড়েছিল। এর জন্য রমেন কোনো রাগ পুষে রেখেছে তাও মনে হয় না। মুরারিও পরে ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে। আদরের ভাইঝির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে রমেনের। তার চাকরিটাও মুরারিরই অনুগ্রহে। সুখের চাকরি বলতে গেলে। খুশী মত যাওয়া আসা। কনফারেনসের সময় মাস খানেক তো অফিসের লোকরা তাকে দেখতেই পায় না। সব চুকে বুকে গেলে রমেন সবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসে, আর দামী সিগারেট খাওয়ায়। 'আপনাদের ভাই কারো কোনো কষ্ট হয়নি তো? সীট খারাপ পড়েনি তো? বউদি চটে যাননি তো আমার উপর?' তারপর পৃথিবীর উদ্দেশে বলে, 'তবে এবারই শেষ। আর ওই ঝঞ্ঝাটিয়া ব্যাপারে এ শর্মা নেই। বাব্বাঃ, বয়েস তো হল। আর ওসব পোষায়?'

সবাই মুচকি হাসে। রমেনকে সবাই চেনে।

সুধীশদের কাছে লম্ফঝম্ফ করে সে। 'আবার যদি এসবের মধ্যে আসি, কান কেটে কুত্তা দিয়ে খাওয়াস তোরা। শালার উচ্চাংগ সংগীত নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। না গভরনমেনটের, না পাবলিকের, না কারু। এমন কি শিল্পীগুলো মাইরি এমন ভাব দেখায় যেন সব জামাই বা গুরুঠাকরুণ। ওঁরা দয়া করে গাইবেন, বাজাবেন, গুচ্ছের টাকা নেবেন। আবার পান থেকে চুণ খসলে চোখ রাঙ্গাবেন। টাকা শুষে নেওয়া ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই তাদের? অ্যাঁ? সবার কাছে চোরের দায়ে ধরা পড়েছে এই রমেনচন্দর। ক্যান রে বাবা? দূর দূর, থাকতে হয় এসবের মধ্যে? আমার মাথাটা সবার কথক নাচবার জায়গা নয়। হুঁ'—

দুই

মহাসম্মেলনের এমারজেনসি সভা শুরু হল।

সংস্থার একসিকিউটিভ কমিটির মিটিং রবিবার ছাড়া কখনও বসে না। তার কারণ প্রেসিডেনট রামকিষণ শাহারিয়া। এক বিলেত চলে না গেলে তিনি

কিছুতেই চেয়ার ছাড়তে চান না। চারজন ভাইস প্রেসিডেনটের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ সভাপতিত্ব করবার সুযোগ পান। আর সভা অন্য কোথাও হতে পারবে না। হবে শাহারিয়া হাউসের বোরডরুমে। আটতলার গোটাটা নিয়ে তিনি নিজে থাকেন। প্রথম সাততলা তাঁর অফিস। চা-বাগান আছে আসামে, ডুয়ার্সে। জুট মিল আছে। কাঠচেরাইয়ের কারখানা আছে। আরও কত হ্যানোত্যাকো। বংশে সব ছিল, ছিল না কালচার। রামকিষেণ শাহারিয়া চূড়ান্ত কালচার করে ছেড়ে দিচ্ছেন। বৃদ্ধ বাপ আজমীরে। দুই ভাই গৌহাটি ডিবরুগড়। তাদেরও টানার চেষ্টা করেছিলেন। পাত্তা পাননি।

তা সপ্তাহের ছদিন অফিস গমগম করে লোকের ভিড়ে। টাইপরাইটার টেলিপ্রিনটারের খটর-মটরের সঙ্গে অন্তত গোটা পাঁচেক ভাষার খিচুড়িতে অফিসঘরগুলো যেন সন্ধ্যাবেলার পাখি ডাকা বটগাছ। তাছাড়া ছদিন রামকিষেণবাবু পাকা বানিয়া। টাকা ছাড়া অন্য চিন্তা গায়েব। রবিবার অফিস ছুট্‌টি করে দেন। সেদিন সব খাঁ খাঁ। শুধু দু-পুরুষের কর্মচারী মুনিম গণপৎ বেজিয়া তাঁর ময়লা ধুতিফতুয়া আর লাল খেরোর খাতা নিয়ে এক কোণায় বসে দেখা হিসেব আবার দেখতে থাকেন।

বৃদ্ধ রামদয়াল বিষম আপত্তি করেছিলেন। সে কী! সারা মাসের মাইনে দিবি! অথচ রোজ কাজ করাবি না? এত নুকসান সহ্য হবে কীভাবে? নতুন বাড়ি দেখেও বৃদ্ধ মহাখাপ্‌পা। তুই লছমি মাঈকে আঁখ দেখাচ্ছিস। গণেশজী গোস্‌সা হবেন। ছব্‌ ছব্‌ এখানে ওখানে পানের পিক আর থুতু ফেলতে লাগলেন। শেষে বৃদ্ধ যেখানে যায় পিছু পিছু একটা জমাদার। রাগ করে বাপ্‌ অফিস যাননি আর কখনও।

রবিবার রামকিষেণজী তাঁর নিজের মহলে আয়েস করেন। খুব গান বাজতে থাকে লাউডস্পীকারে। এঘরে রবিশংকর, শুভলক্ষ্মী। ওঘরে লতা, কিশোরকুমার। আর থেকে থেকে মারচিং সঙ্‌: কদম কদম বাঢ়য়ে জা! কলকাতার শিল্পীদেরও প্রায়ই ডাকেন মুজরো দিয়ে। খুব গোপনে কিছু লোককে চেলাও বানিয়ে নেন। বিশেষত তরুণ তবলিয়ারা যায় টাকার দরকার হলে। নাড়া বাঁধলেই বাঁধা ফি দুশ টাকা। লাখনাউ থেকে নিরলাবাঈ এসে অতিথ্‌ হয়েছিলেন রামকিষেণজীর। মজা করে তিনিও নাড়া বাঁধলেন। পুলকিত উস্তাদ তাঁকে দিলেন নগদ এক হাজার এক টাকা। বানারসী শাড়ি। রুপোর একসেট গয়না।

সপ্তাহ ধরে রামকিষেণজীর ড্রেস হল পাকা মিলিটারি। মোম দেওয়া ছুঁচলো গোঁফ বাগিয়ে দাঁড়ালে তাঁকে সত্যি মিলিটারি অফিসারের মত দেখায়। রমেন বলে প্রতাপ সিং একমাত্র শিখ যে রাগ শুনে চিনতে পারে। আর রামকিষণজী একমাত্র মাড়োয়ারী যার বয়স চল্লিশ, কিন্তু ভুঁড়ি নেই।

অন্য রবিবারে ঢিলাঢালা পোষাক পরলেও মহাসম্মেলনের সভার দিন

রামকিষেণজীর অঙ্গে ওই সামরিক পোষাক। সভা শুরুর মুখে তিনি একবার সদস্যদের দিকে তাকিয়ে নিলেন। যেন সেনাপরিদর্শন সারছেন। তারপর রমেনকে কথাবলার অনুমতি দিলেন। দেয়ালে টাঙ্গানো নেতাজী মনে হল তাঁর মাথা একটু ঝুঁকিয়ে 'শাবাশ' জানালেন।

খুব ভণিতা করার অবোশ নেই রমেনের। বললে, 'আপনারা জানেন আমাদের মোস্ট এফিসিয়েনট মিসেস রঙ্গনাথন উস্তাদ করিমুদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুতে সংস্থার সদস্যদের গভীর বেদনার কথা জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উস্তাদের পরিবারের কাছে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। আবার নন্দ মিত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিউজ এজেনসি মারফৎ খবরটা কাগজের অফিসগুলোকে জানিয়ে দেন। ফলে পরদিন সকালের কাগজে, বড় বড় তিনটে কাগজে, ডেথ নিউজের সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামটাও পাবলিকের সামনে ফ্ল্যাশড্ হয়েছে। আমাদের অরগানাই-জেশন অবশ্য কলকাতার প্রিমিয়র কালচারাল ইয়ে, মানে—সবাই জানে সেটা। তবু'—

রামকিষেণজী গোঁফে হাত রেখে বললেন: 'ওই ব্যাপারটাতে আমি খুশী নই। সবাই মিলে আমাকে প্রেসিডেনট করলেন। কিন্তু কাগজে নাম বের হল শুধু একজন জয়েনট জেনারেলের। এটা ঠিক না।'

কান লাল হয়ে গেল মিসেস রঙ্গনাথনের। 'ওটা আমার ফল্ট কিন্তু নয় মিঃ প্রেসিডেনট। খবর পাবামাত্র আমি চিঠি পাঠিয়েছি। একজন কারো সই করতে হয়, তাই আমি সই করেছি। এখন কাগজ যদি আমার নাম ইউজ করে আমি কী করতে পারি?'

তাড়াতাড়ি রমেন বলেন: 'মিঃ প্রেসিডেনট, আমি না বলে পারছি না; কাগজের স্টেটমেনটে যেটুকু যা খামতি ছিল আপনার রেডিওতে সুপারব্ ইনটারভিউটা সব ত্রুটি শুধরে দিয়েছে। যারা শুনেছে কেউ চোখের জল সামলাতে পারেনি। আমি মনে করি এটা মিসেস রঙ্গনাথনের দারুণ বুদ্ধির কাজ হয়েছে। রেডিও-র লোকরা ও'র কাছেই তো গিয়েছিল। উনিই তো তাদের আপনার কাছে পাঠান।'

মিসেস রঙ্গনাথন চমকে তাকালেন রমেনের দিকে। আর সবাই তাঁর দিকে।

গলা খাঁকারি দিয়ে রামকিষেণজী বললেন: 'আমি জানতাম না। থ্যাংক ইউ মিসেস রঙ্গনাথন।'

রমেন কথাটাকে বাড়তে দিল না। অবনী পালটা মুখিয়ে আছে। বললে, 'মিঃ প্রেসিডেনট, আমাদের বার্ষিক মহাসম্মেলনের আর মাত্র আড়াই মাস আছে। এখন যদি আমরা একটু গা না ঘামাই, যদি এটাকে একটা চ্যালেনজ, একটা লড়াই বলে ধরে না নিই, তবে শত্রুরা ছি ছি করবে। আমাদের এবারের মহাসম্মেলনকে এমন করতে হবে যাতে অন্যান্য রাইভাল অরগানাইজেশন সব

ভেড়ুয়া বনে যায়।'

টেবিলের চারপাশে সবাই বললেন, 'ঠিক কথা।' লড়াইয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই মিলিটারি মোচে হাত রাখলেন রামকিষেণ। টান টান হয়ে বসলেন।

'আমি সাজেসট করি'—রমেন বললে—'সবাই আমরা আমাদের টাকা সংগ্রহের পরিমাণ সাধ্যতম বাড়াব। দুশো, পাঁচশ, হাজার, দুহাজার করে। আর ওই টাকাটা উস্তাদ করিমুদ্দিন খাঁর বেগমের হাতে তুলে দেব। আর এবারের মহাসম্মেলন ডেডিকেট করে দেওয়া হোক পরলোকগত উস্তাদের নামে। তারপর দেখি কোন্ শালা—মানে কে আছে, যে আমাদের সঙ্গে টক্কর মারতে পারে।'

সুধীশ বললে: 'আমেন।' আস্তেই বললে যাতে কেউ শুনতে না পায়।

শুধু ভাইস-প্রেসিডেনট শংকরবাবু সুধীশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। পুরু ফ্রেমের চশমা, চোখে বড় কম দেখেন। কিন্তু কান দারুণ শার্প। ক্রিকেট মাঠের একজন চাঁই। দূরের আউটফিল্ড দেখতেই পান না। উইকেট দেখেন আন্দাজে। কিন্তু ব্যাটসম্যান আর উইকেটকীপার কোন্ কথা নিয়ে রসিকতা করল তাও বলে দিতে পারেন। ম্যাজিকের ব্যাপার মনে হয়।

শংকরবাবু মিটিং করতে নিয়মিত আসেন। আলোচনাতে বড় একটা যোগ দেন না। প্রয়োজন না হলে দেন না। যখন দেন সবাই কান খাড়া করে শোনে। যেমন গত বছর সভ্যরা খুব উত্তেজিত। একজন সেতারী সদ্য বিলেত ঘুরে এসে ফি বাড়িয়েছে পাঁচশ। তাকে নেওয়া হবে কি হবে না এই নিয়ে তর্ক। রমেন নিতে চাইছে। অবনী পাল এগেনস্টে। শংকরবাবু প্যাড থেকে মুখ তুলে গলা খাঁকারি দিলেন। সবাই চুপ। তখন শংকরবাবু বললেন, 'ছেলেটা আমাদের মহাসম্মেলনে বাজিয়েছে তিন বছর আগে। তখন পেটরোলের দাম কত ছিল, আর এখন কত?' ওইটুকুই বললেন। আর কিছু না। কিন্তু ভোটে রমেনের প্রস্তাব তাতেই পাশ হয়ে গেল।

শংকরবাবু প্যাড নিয়ে বসে থাকেন। তাতে নাম লেখেন। ক্রিকেটের সভায় জীবিত-মৃত খেলুড়েদের নিয়ে ওয়ারল্ড ইলেভ্ন। অল টাইম ইনডিয়ান ইলেভ্ন। আর এই সভায় এসে বানান সাতটা অলনাইট সেসনসমন্বিত মহা-সম্মেলন। আবদুল করিম, ফৈয়জ, বড়ে গোলাম, ওঁঙ্কারনাথ, পালুসকর, কেশরবাঈ, গঙ্গুবাঈ, সিদ্ধেশ্বরী, মঘুবাঈ, মইনুদ্দিন-আমিনুদ্দিন, তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ী, আমীর খাঁ, বেগম আখতার, ভীমসেন, এ কানন, মুনোয়ার, শরাফৎ, প্রসুন, মীরা ব্যানারজি, সুনন্দা পট্টনায়ক, মালবিকা, আলাউদ্দিন, হাফেজ আলি, আলি আকবর, আমজাদ, রবিশংকর, বিলায়েৎ, হালিম জাফর, নিখিল বন্দ্যো. কুমার, অন্নপূর্ণা দেবী, মণ্টু ব্যানারজি, জিয়া মহীউদ্দীন, শিবকুমার শর্মা, শম্ভু মহারাজ, বিরজু মহারাজ, রোশনকুমারী সিতারা, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, আহম্মদজান থেরেকুয়া, আনোখিলাল, কণ্ঠে

মহারাজ, কিষেণমহারাজ, শান্তাপ্রসাদ, কেরামৎ, কানাই দত্ত, শংকর ঘোষ, শ্যামল বোস। একটু দম ধরে আবার লিখলেন: ভীষ্মদেব, বিসমিল্লা, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আল্লারাখা, হবিবুদ্দিন, সাগীরুদ্দিন, জাকির হুসেন। চুপ করে কিছুক্ষণ রইলেন। তারপর লিখলেন: সাত নয়, আট হোল নাইট লাগবে। টাকা দেবে কে? হোয়াই! গৌরী সেন। অর্থাৎ ভারত সরকার। শাহারিয়া ইজ এ ফুল। অবনী ইজ এ রোগ। আই অ্যাম এ জোকার। সি-কে-নাইডু ওয়াজ গ্রেট।

মিটিং ফুরোতে সময় লাগল। কারণ, না খাইয়ে রামকিষেণ ছাড়লেন না। ওটা বরাবরের নিয়ম।

স্যালাড খেতে খেতে মিসেস রঙ্গনাথন বললেন, 'ওটা কী হল রমেনবাবু? আমি তো রেডিওর লোক পাঠাইনি।'

রমেন বললে, 'আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু মিথ্যে কথাটা না বললে কাজের কথা ধামাচাপা পড়ে যেত। ওই নিয়ে অন্যান্য সদস্যরা মুখ খুললে আর উপায় থাকত না। বিশেষত ওই অবনী হারামজাদাটা। ও আমাকে আপনাকে একদম সহ্য করতে পারেনা আশা করি জানেন। তাছাড়া, আমার ইনফরমেশন ছিল, দুজন ইনফ্লুয়েনশিয়াল মেমবার প্রেসিডেনটের কাছে কাঁদুনি গেয়ে রেখেছেন যাতে টাকার চাপ না বাড়ে। প্রেসিডেনটকে হাত করার দরকার ছিল। কিন্তু যাক্ ওকথা। আপনি কবে আমাকে নিয়ে বসছেন আরটিসট তালিকা ঠিক করবার জন্য? যতই লোকের ওপর দায়িত্ব থাকুক না কেন, কাজ তো সবাই করবে লবঘণ্টা। ও তো আপনাকে আমাকেই করতে হবে। আপনি কিন্তু কাল পরশুর মধ্যে কলামন্দির বুক করে ফেলবেন। চেকে আমার সই আছেই। আপনি সই করে ছেড়ে দেবেন। আর হ্যাঁ, কুমারকে প্লিজ আমার হয়ে লিখে দেবেন। ওঁকে ছাড়া আমাদের মহাসম্মেলন কিন্তু অচল। করিমুদ্দিনের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কাকে বলা যাবে, বলুন তো? আঁখি দেবী তো থাকবেনই। তাছাড়া? মিস্টারকে বলবেন, এবার কিন্তু দু-হাজার বেশী চাই ওর কাছে। সেজন্য ওঁর বেয়ারা-খানসামাকেও প্রোগ্রাম দিতে আমি তৈয়ার। হাঃ হাঃ।'

এক ফাঁকে সুধীশকে বললেন মিসেস রঙ্গনাথন, 'আপনার কাছে স্পেয়ার তুলো আছে সুধীশ? দিন না আমার কান প্লাগ করে। রমেনের কথা আর তো শুনতে পারছিনে।'

সুধীশ হেসে বললে, 'তাহলে আমার কথা শুনুন। এই পিন্‌ক শাড়িটাতে আপনাকে না অপূর্ব দেখাচ্ছে!'

ময়দানের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে মিসেস রঙ্গনাথন ভাবলেন: এবারে কুমারের আসা বন্ধ করতে হবে। অ্যাট অল কস্‌ট। নইলে ধরা পড়ে যাব।

রমেনের সঙ্গে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে সুধীশ ভাবছিল, পিন্‌ক শাড়ির প্রসঙ্গ না তুললেই ভাল হত। যে কথাটা বললে সেটাও তো ধার করা। ঠিক ওই কমপ্লিমেনট তার সামনেই কুমারনাথ কপিল দিয়েছিলেন প্রিয়া রঙ্গনাথনকে।

নির্জন বোরডরুমে বসে টেলিফোনে কথা বলছিলেন রামকিষেণ। 'এইবার যত লাফাবার লাফিয়ে নিক রমেন। আমি ওকে বুঝিয়ে দেব নেক্‌স্‌ট টাইম। আমি পুরো টেক ওভার করে নেব। আপনি আপনার বোনের ফোটো আর জীবনী পাঠিয়ে দিন না আমার কাছে। আমি দেখব।'

গ্র্যানড হোটেল থেকে ফোন করছিল নন্দ মিত্তির। 'মুরারিদা, সব ঠিক হয়ে গেল। পাঁচদিন কলামন্দিরে হবে। বাইশ থেকে ছাব্বিশ। লাস্ট দিন হোল্‌ নাইট। কনফারেনস ডেডিকেটেড টু করিমুদ্দিন।

মুরারি ফোন করলে তার চেনা প্রেসকে। খালেদ, হ্যাঁ, একশ ফরম চাই। ওই আগের মত। মহাসম্মেলন কথাটা করবে মহাসম্মেলম্‌। বুঝলে? এল-এ-এন নয়, এল-এ-এম। হ্যাঁ মাদ্রাজী কথার মত শোনাচ্ছে। তাই শোনাবে।

মুরারির নিস্তরংগ জীবনে হঠাৎ চাঞ্চল্য এসেছে। সারা ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। খালেদ ফরমগুলো এনে দিলেই সবার চোখে ধুলো দিয়ে তাকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে বেরুতে হবে। প্রচুর ঘাঁটি জানে মুরারি যেখানে রমেনের চররা যাবে না। সেইসব জায়গায় গিয়ে বিজ্ঞাপন নিয়ে আসতে হবে। ভবানীপুরের একটা ছোট ব্যাংকে তার 'নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত মহাসম্মেলম্‌' নামে অ্যাকাউনট খোলা আছে। সেখানে চেকগুলো জমা দিতে হবে। চেনা লোক আছে। কলকাতা জুড়ে বেশ কটা ব্যাংকে তার ওই ধরনের অ্যাকাউনট। বড় বড় সব সম্মেলনের নামে। কেবল ওই একটা হরফের এদিক ওদিক করে আইনরক্ষা করা। মুরারি যখন সংগীত সমাজের বাদশা ছিল তখন কত লোককে কত ফেবার বিলিয়েছে। তার কিছু সুদ এখন আদায় হচ্ছে।

চেক জমা দিয়ে টাকাটা তুললেই কি কাজ শেষ? না। খালেদকে দিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো ছাপিয়ে রাখতে হবে। লুজ কয়েকটা পাতা। তারপর রমেনের স্যুভেনির গোটাকতক সংগ্রহ করে, বাঁধাই খুলে, ওই পাতাগুলো জুড়ে দিতে হবে। তারপর বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে দিয়ে এস। কোনো ব্যাটার সাধ্য নেই ধরে।

টাকাগুলো তো ফাউ। আসলে সব ব্যাপারটার মধ্যে মুরারির নিজস্ব প্রতিভার ছাপ আছে। নিজের কুবুদ্ধির কারুকার্যে নিজেই মোহিত হয়ে বসে থাকে মুরারি। এসব নইলে আর জীবন কী? যত্ত পাতিহাঁসের প্যাঁক প্যাঁক।

রাত্রে কুমুদ বললে: এবার কিন্তু টুলুকে নামাতে হবে তোমার। ওর মত ঠুংরী তোমাদের কোনো মেয়েছেলে গাইতে পারে না। আর রহমৎ তবলা বাজাবে।

মুরারি বললে: বেশ তো। রমনাটাকে তুইই বল্‌না। যদি শ পাঁচেক টাকা দান করিস তবে টুলুকে ও চাই দুটো প্রোগ্রামও দিয়ে দেবে। নো প্রবলেম।

কুমুদ বললে: বা রে, আমার মেয়ে গাইবে টাকা আমি দেব কেন? টুলুকে রমেনবাবু টাকা দেবেন।

মুরারি হাসলে। ওই বুদ্ধি নিয়ে চললেই হয়েছে আর কি? রমেনের গুরু কে জানিস? আমি, মুরারি সেন। আর আমার গুরু? দেবর্ষি নারদ। নারদ হলেন আমাদের মত কনফারেনস-ওলার সিদ্ধিদাতা মহাগুরু। শিল্পীরা বেশীর ভাগই তো মহাদেবের মত বোমভোলা। হাতে তানপুরা তুলে দিল তো চোখ মুদে গাইতে লাগলো। এদিকে শ্রোতাদের কাছ থেকে মালকড়ি যা নেবার নিয়ে ট্যাঁক ভারী করলেন নারদমুনি।

থেমে গেল মুরারি। এসব কথা কুমুদকে বলে লাভ কী? বুঝবে না। হাঁই তুলতে থাকবে। আর হাঁইতোলা কুমুদকে বিছানায় নিয়ে সুখের আশা বৃথা। তাকে তাতাতে তাতাতে সব উৎসাহ নিভে আসার দাখিল। তার চেয়ে নির্জলিংগাপ্‌পা হয়ে যাওয়াও অনেক সহজ।

মুরারি বললে, চ কুমু, এবার তোতে আমাতে রমেনের জলসায় নামি। ফর অ্যাডালটস ওনলি প্রোগ্রাম করলে মেলা টাকা কামাবে রমনা। আসুন দেখুন, কিন্নরকণ্ঠী কুমুদিনীর বস্ত্রহরণ। আর আচার্য, পণ্ডিত, উস্তাদ মুরারি প্রসাদের—

বাকিটা কুমুদের ধবলগিরি কাঞ্চনজংঘার তলে চাপা পড়ে গেল।

তিন

লিখতে লিখতে চিঠিটা বড্ড লম্বা হয়ে গেল শঙ্খদা। তোমার পড়ার ধৈর্য থাকবে তো? কী করি বল। বড্ড একলা হয়ে গেছি। একটা গল্পের বইতে পড়েছিলাম, পইতে হলে বামুনদের নাকি জীবনটাই আলাদা হয়ে যায়। চেনা-জানা ওইরকম ছেলে যে-কটা দেখেছি, তাদের দেখে কিছু বুঝতে পারিনি অবশ্য। এক ওই মাথায় ছোট চুল। তা সে তো বাপ মা মলেও তোমরা সবাই কর। আমার কিন্তু সত্যি শঙ্খদা একেবারে সব কিছু চেন্‌জ হয়ে গেল বাবা মারা যেতে। সবাই যেন আমাকে ত্যাগ করল শঙ্খদা। মা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। সব দোষ যেন আমার। বাবা মরে গেলেন। আমি তো তাঁকে মারিনি। তাঁর তো শরীর খারাপই ছিল। বিশেষ করে এবার কাবুল থেকে ফেরার পর। একদিন রাত্রে তালিম দিচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে গেলেন। দেখি মুখচোখ সব টকটকে লাল হয়ে গেছে। এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত শরীর ঘেমে

অস্থির। রিওয়াজের জন্য পাখা লো করা ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে ফুল করে দিলাম। দাদাকে ডেকে আনলাম। এসে দেখি বাবা কামিজের বোতাম খুলতে না পেরে টেনেটুনে সবটাই ছিঁড়ে ফেলেছেন। বেচারা পরোজ ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। কিছু বুঝতে তো আর পারছে না। রাঙা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। দাদা দৌড়ে গেল ডাক্তার ডাকতে। এদিকে বাবা একবার শুয়ে পড়ছেন, আবার উঠে বসছেন। স্বস্তি নেই একবিন্দু। আমি ওর মধ্যেই হাত-পা টিপে দিচ্ছি। বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মা গেছে আবুর মায়ের সঙ্গে সিনেমায়। কখন যে আসবে। দাদা আর কাউকে না পেয়ে পাড়ার খিটখিটে হারুবাবুকে নিয়ে এসে হাজির। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, কিছু না, হজমের গোলমাল। নাভির কাছে নারকেল তেল আর জল মিশিয়ে মালিশ করুন। কিছুদিন পেঁয়াজ রসুন আর ওই নিষিদ্ধ মাংসটা বাদ দিন। ওই নিয়ে পরে আমরা হাসাহাসি করেছি। খাবার টেবিলে বসে বাবা বলতেন নিষিদ্ধ মাংস নিষিদ্ধ মাংস, আর জোরে জোরে হাসতেন। (শঙ্খদা, বাবার মত অমন হাসি কেউ হাসে না। মানুষ কেন অমর হয় না শঙ্খদা? হোয়াই মাসট হি ডাই? হাউ ভেরি আনফেয়ার!)

মা যখন ফিরে এলো বাবা তখন ওই ফরাসের উপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা বলল, 'তুই পরোজকে নিয়ে গিয়ে ঘুমোগে যা। আমার বালিশটা এখানেই এনে দে।' পরদিন বাবা একদম অলরাইট। কিন্তু চোখের কোণায় কালি জমেই রইল। আমাকে একদিন বললেন, 'এমন জ্বলে যায় শরীরের ভেতরটা মাঝে মাঝে। কী যে হয়েছে বুঝতে পারছি না।' ইদানীং আবার খুব চাপাচ্ছিলেন আমার ওপর। এটা শিখে নাও, ওটা শিখে নাও। একগাদা পাল্টা দিতেন। তৈরী করা কি সোজা? একেকদিন খুব রেগে যেতেন। বকুনির চোট সামলাতে না পেরে বললাম, ড্যাডি, তুমি চল্লিশ বছরে যা মাসটার করেছ, আমি চল্লিশ মিনিটে তা তুলে নিতে পারি? বাবা তানপুরার সঙ্গে কপাল ঠেকিয়ে বললেন, সুমন মায়ী সময় যে নেই! সময় যে একদম নেই।

সেই বাবা চলে গেলেন। আমি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলাম শঙ্খদা। আমাকে খুঁজতে বেরিয়েই বাবা স্ট্রোক হয়ে মারা যান। তাই সবাই মনে মনে আমাকেই দোষী করল। আমার কোনো মুখ ছিল না। সব নিঃশব্দ তিরস্কার আমি মাথা পেতেই নিলাম। আমার যে কী গেল কেউ তো জানল না। অত ভালবাসে দাদা আমাকে। দাদাও যেন পর করে দিল। শুধু তোমার মা, শঙ্খদা, আমাকে বুকে টেনে নিলেন। তোমার মা, যাঁকে আমি গোপনে হিংসা করতাম। বাবা অত ভালবাসেন বলেই হিংসা হত।

অন্য সব বলার আগে একটা পাপের কথা জানিয়ে রাখি তোমাকে। মন খুলে সব জানাই। তারপর তুমি ক্ষমা করতে হলে করবে। না পার কোরো না।

আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমি মেয়েমানুষ। আমি

এতই মেয়ে যে আর কোনো মেয়েকে আমি পুরোপুরি আপন ভাবতে পারি না। ছোটবেলা থেকে ছেলেরাই আমার বন্ধু। তাদের সঙ্গেই আমার বনে। মেয়েদের সঙ্গে না। ক্লাসের মেয়েরা শরীর-টরীর নিয়ে কথা বললে আমার গা ঘিনঘিন করত। ওদের অশ্লীলতা আনডাইলিউটেড অশ্লীলতা। অথচ ছেলেরা খারাপ কথা বললে আমার কাছে সেটা স্বাভাবিক মনে হত। একধরনের শারীরিক সুখ ফিল্‌ করতাম।

তোমার সঙ্গে আমি এত মিশেছি। অথচ তুমি এসব কোনোদিন বুঝতে পারনি। লাস্‌ট যেদিন সিনেমায় গিয়েছিলাম, মনে আছে? আমি নিজে গিয়ে টিকিট কেটে এনেছিলাম। লাইটহাউসের সেই দুটি সীট যার পিছনে গদীআঁটা দেয়াল। চারপাশে মোহন অন্ধকার। ছবিটাও খুব ঘন প্রেমের ছবি ছিল। তাতে কী হল? তুমি নির্বিকার আমার পাশে বসে বসে সিনেমা গিলে গেলে। আমি তোমার হাত ধরে নিলাম। তুমি হাতে হাত ধরা দিয়ে বসে রইলে। আমি দারুণ একটা ঝড় বুকের ভিতর নিয়ে কাঁপতে লাগলাম।

ফেরার পথে তোমায় ট্যাক্সি নিতে দিলাম না। বললাম, খুব চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। মারকেটের নিরিবিলি দোকানটায় পর্দাঢাকা ঘরে বসে বিস্বাদ চা গিলতে হল। তুমি কিচ্ছু করলে না।

লাভার্স লেন দিয়ে হেঁটে গেলাম ভিকটোরিয়া অবধি। তুমি মুগ্ধগলায় সিনেমার গল্প করে গেলে। অন্ধকার মাঠে আমিই তোমাকে টেনে নিয়ে বসালাম। আমার শরীর পুড়ে যাচ্ছিল। তুমি পুরুষমানুষ। ইনিসিয়েটিভ নেবার কথা তোমার। অথচ তুমি...

বাড়ির দরজায় এসে আমি আর পারলাম না। দুহাতে তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। তুমি যে কী অবাক হয়েছিলে আজও মনে আছে। তারপর এতক্ষণ বাদে যেন তোমার ঘুম ভাঙল। তুমি নিজেই এগিয়ে এসে...

ঠিক সেই সময় ঘড়ি ধরে যদি নাটকটা না হত, যদি টুক করে দরজাটা খুলে পীর সাহেবের টিফিন ক্যারিয়ার হাতে দর্শন না দিত আমাদের চাকরাণী মরিয়ম, আর তার পিছনে দাঁড়িয়ে মা দেখে না ফেলত তোমাকে আমাকে, তাহলে কী হতে পারত বল তো! কত কিছুই যে হতে পারত! হল না। মাঝ থেকে তুমি আসাই বন্ধ করে দিলে। মা কি কিছু বলেছিল তোমাকে?

তারপর তুমি বিলেত চলে গেলে। কত রাত্রে বালিশ ভেজালাম আমি তোমার কথা ভেবে। তার কতটা তুমি জান? রাগ কোরোনা শঙ্খদা। তুমি কি সেই আগের মত ভীতু আছ? না ওদেশে গিয়ে সাহসটাহস হয়েছে? মেম বন্ধুটন্ধু হয়েছে? তারা তোমার কাছে আসে, না তুমি তাদের কাছে যাও? তোমার মা আশ্চর্য মানুষ। আমি একদিন ঠাট্টা করে বললাম, আনটি, শঙ্খদার মেমবউ হলে কেমন হয়? তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, ছেলে যাকে পছন্দ করে

বিয়ে করবে সে নিশ্চয় ভাল মেয়ে হবে। মেম হলে মেম, সাঁওতাল হলে সাঁওতাল।

তুমি তো গেলে। এল আবু। আলিগড় থেকে ভাল পাশটাশ করে। আবুকে মনে আছে? ছিপছিপে, দারুন রগুড়ে, আড্ডাবাজ আবু। তোমাকে ক্যারম, টেবল টেনিস, ব্যাডমিনটন সব খেলায় হারিয়ে দিত। আর তুমি গুম হয়ে যেতে! মনে আছে? ওই আবু এসে বাপের বিজনেসে ঢুকল। কী বিজনেস করত ও-ই জানে। কেবল দেখেছি রাজ্যের মেয়েদের সঙেগ আড্ডা দিয়ে বেড়াত। আমাকে কিন্তু এড়িয়ে যেত। রোখ চেপে গেল কেমন। দেখি ও আমার প্রেমে পড়ে কি পড়ে না। একদিন বোধ হয় মদ খেয়েছিল। বন্ধুদের মাঝখানেই বলে বসল, এই শঙখ নাকি তোকে...? আমি ধাঁই করে ওর তলপেটে লাথি মারলাম। সবাই হেসে উঠল। ব্যথায় নীল হয়ে গিয়েছিল আবুর মুখ।

পরের মাসে ওর জন্মদিন। সব চেয়ে ছোট্ট প্যাকেটটা আমার কাছ থেকে প্রেজেন্ট হিসাবে ও পেল। সবাই গবেষণা করছে, সুমন কী দিল তোকে, নিশ্চয় দামী রিং ফিং হবে ইত্যাদি। আবু বললে, কী রে সুমন? আমি বললাম, রাত্রে খুলিস।

পরদিন খুব ভোরে আবু এল। বাড়িতে সবাই ঘুমুচ্ছে। আবু বললে, হাত পাত্। ওর মুঠি থেকে আমার হাতে চলে এলো একটা কাঁকড়া বিছে। আঁৎকে উঠে হাত ঝেড়ে ফেলে দিলাম মেজের উপর।

আবু বললে, রুপোর কৌটো করে এই প্রেজেন্ট দিয়েছিলি তুই? যদি ওটা মরে না যেত, কামড়ে দিতে পারত। বদমাশ মেয়ে, তোকে নাঙগা করে চাবকানো দরকার। আমি বল্লাম, যা-যাঃ।

পরে মা জিজ্ঞেস করলো, তোর ঠোঁট ফোলা ফোলা লাগছে কেন? উত্তর দিলাম, বোল্‌তা কামড়েছে।

এই শেষ নয়। সব তোমাকে বলব আজ। আমি আবুকে বিয়ে করতে চাইলাম। তাই নিয়ে খুব গন্ডগোল। আবু বাবার কাছে বড় ঘেঁষত না। মার কিন্তু খুব পেয়ার ওর জন্য। সেই মা সাফাসাফি বলে দিল, বিয়ে হবে না। কিছুতে না। এ বাড়ি ও বাড়ি. কারও মত নেই।

আবু বললে, চ পালিয়ে যাই আমরা। আলিগড়, না হয় নৈনি চলে যাই। অনেক বন্ধু আছে আমার। কোনো ঝঞ্ঝাট হবে না।

ইলোপ করব শেষ পর্যন্ত? আমাদের স্কুলের এক সিসটার, অ্যাডিশনাল ইংলিশ পড়াতেন আমাদের। কী প্রাউড; বলতেন আমার উচ্চারণে যে ভুল ধরবে, প্রতিটি ভুলের জন্য তাকে আমি হানড্রেড রুপীজ দেব। সেই তিনি, একটা স্কুল ফাইন্যাল ফেল লোকের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন উলুবেড়িয়া। উলুবেড়িয়া! ভাব তুমি একবার। তা সে হিসেবে আলিগড় তো অনেক বেশী গ্ল্যামারাস।

আব্দু সব কিছুর কনট্রোল নিয়ে নিল। আমাকে ভাল করে ভাবতে পর্যন্ত দিল না। জীবনে প্রথম, মেয়েবন্ধুর অভাব বোধ করলাম। কারও সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার ছিল। কিন্তু তখুনি, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগেই, মনে হতে লাগল আমার কেউ নেই। বাবার জন্যই সব চেয়ে কষ্ট, কারণ তিনি দুঃখ পাবেন খুব বেশী। আবার তাঁকেই ভয়। তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারা যাচ্ছে না।

আব্দু হল আমাদের যুদ্ধজয়ের সেনাপতি। প্ল্যানট্যান সব ছকে দিলে। বাবা যাচ্ছেন প্রোগ্রাম নিয়ে বাইরে। ওই সুযোগে পালাতে হবে। কয়েকদিন আমি চুপটি করে বাড়ি বসে রইলাম। আব্দু যোগাযোগের কোনো চেষ্টাই করল না। প্ল্যান মাফিক।

সেই রাত্তিরটা কখনও ভুলব না শঙ্খদা। ছোট একটা ব্যাগে দুচারটে মাত্র পোষাক আর টুকিটাকি ভরে রেখে দিলাম আলমারীর মধ্যে। পরোজকে নিয়ে শুতে যাবার আগে মা এল ঘরে। মার মুখ একটু নরম মনে হল। 'খাঁ সাব চলে যাবার পর একদিনও গানের ঘরে বসিস নি। কেন রে? পরোজটার তো কম সে কম তালিম পাওয়া দরকার।' হঠাৎ মনে হল মা খুব কাছে এসে গেছে। ইচ্ছে হল জড়িয়ে ধরি। সব কথা বলি। মা, কী করব আমি?

মা-ই এসে আমাকে জড়িয়ে নিল। দুচোখে জল এসে গেল আমার। মা বললে, তুই কেন মন খারাপ করে আছিস? বিয়েশাদির ব্যাপারটা বড় গোলমালের। ছোটরা সব বোঝে না। মা বাবার কথা শোনাই তো ভাল। আমরা তোর ভালই চাই। তুই এরকম জিদ করে তোর বাবাকে কত কষ্ট দিলি! শরীর ভাল নেই মানুষটার।

বললাম, মা, আব্দুকে তুমি কি আর একটুও লাইক কর না?

মা আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মার চোখে জল। কিন্তু মুখটা আবার পাথর পাথর। মা পরোজকে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। যেতে যেতে পরোজ বলল, কাল সকালে আমি কিন্তু টুথব্রাস করব না মা। দিদিকে বলে দাও সে কথা।

বিছানায়, কেদারায়, চুপ করে বসে রইলাম। কাঁদলাম। ঢুললাম। উঠে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখলাম। জল খেলাম। আবার বসলাম। এক চোখ সর্বদা ঘড়ির দিকে। বুকের মধ্যেও একটা ঘড়ি জোরে জোরে শব্দ করে চলছিল। হুসেন সাহেবের আঁকা বাবার ছবি সামনের দেয়ালে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। ওঁরই আঁকা দাদার (বড় খাঁর) ছবিটা বাবার শোবার ঘরে। সেটা দেখার ইচ্ছা হল খুব। কিন্তু উপায় কী? অনেকবার বাবা বলেছেন, 'চাচাজীর ছবিটা গানের ঘরে এনে রাখব।' কিন্তু রাখা হয়নি শেষ পর্যন্ত। একদিন ঠাট্টা করে কাকে যেন বলছিলেন, 'ওঁর ছবি সামনে রেখে গলা খুলতে এখনও ডর লাগে। এখনও নিজেকে কৌয়া কি ভঁয়েস মনে হয়।' ছবিটা

সম্পূর্ণই কল্পনায় আঁকা অবশ্য। বাবা বলে বলে গেছেন, হুসেন সাহেব এঁকেছেন আমাদের বাড়ি বসে। ভারতবিখ্যাত আরটিসট। দারুণ মেজাজী। কিন্তু বাবাকে একটিবার ধমকান নি পর্যন্ত। দিললির একজিবিশনে মেডেল পেয়েছিল ছবিটা। কোন্ মন্ত্রী শুনেছি কিনতে চেয়েছিল। হুসেন সাহেব 'নট ফর সেল' বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একজিবিশন শেষে বাবার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়তে হল। চটপট তৈরী হলাম। আয়নায় যেন অন্য কাউকে, আধচেনা কোনো মেয়েকে দেখছি মনে হচ্ছিল। বাইরে মেঘ ডাকছিল মাঝে মাঝে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

লম্বা করিডর দিয়ে হেঁটে গেলাম। বাড়ি চুপচাপ। বাবা নেই, দাদা নেই। সিঁড়ি দিয়ে আবছা অন্ধকারে আমি নেমে যাচ্ছি। আর হলঘর থেকে একটা বেড়াল উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। সামনাসামনি হতে দুজনেই থমকে দাঁড়ালাম। বেড়ালটা লাল তালু দেখিয়ে ম্যাঁও বললে একবার। তারপর পাশ কাটিয়ে তুরতুর করে উঠে গেল উপরে। আমি আবার নামতে লাগলাম।

নিজের এতদিনকার ঘরটা ছেড়ে আসতে কষ্টই হয়নি। কিন্তু গানের ঘরের সামনে এসে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল। মনে হল, বাবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, বড় খাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ওই গানের ঘরই তো আমাদের ঘর! সেই ঘর ছেড়ে যাচ্ছি বিদেশী সেজে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলাম। বড় পার্কটার কোণায় এসে দাঁড়ালাম। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ছাঁট, অদ্ভুত আরাম দিচ্ছিল। ঘড়ি দেখলাম। পাঁচ মিনিট বাকি। এখন যদি চেনা কেউ দেখে ফেলে? শিউরে উঠলাম। হাতের ব্যাগ বড় ভারী মনে হল। আবার ঘড়ি দেখলাম। দমকা হাওয়ায় পার্কের গাছগুলো মাথা দোলাতে লাগল পাগলের মত। যেন এখুনি হা হা কৌতুকে হেসে উঠবে! ঝোড়ো হাওয়া আমাকে মাটি থেকে তুলে ফেলতে চাইছে। তুলে ফেল, আমি বলতে লাগলাম অদৃশ্য কাউকে। তুলে ফেল সহজেই। আমার কোনো শিকড় নেই। আমি নিজে সব ছিঁড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছি।

ঘড়ির দিকে তাকালাম, ঘড়ি বন্ধ। হাত ঝাঁকালাম। কানের কাছে আনলাম। ঘড়ি বন্ধ। সময় থেমে গেছে। কী মজা! আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমাকে কিছু করতে হবে না। আমি যেখানে, কেউ আমাকে ধরতে ছুঁতে পারবে না। আবু গাড়ি হাঁকিয়ে যেদিক থেকেই আসুক না কেন, আমার কাছে পৌঁছবার পথ পাবে না। ঠুসি নিয়ে দৌড়ে আসুক মা। আমি স্ট্যাচু হয়ে গেছি।

বেশ জোরে বৃষ্টি নামল। আর হলুদ বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে মোড়ের মাথায় উঠে এল আবুর গ্রে ফিয়াট। মুখে চোখে বৃষ্টির ছাঁট। ভাল করে দেখতে

পাচ্ছি না কিছু। দৌড়ে গেলাম গাড়ির দিকে। আর ওইটুকু যেতে যেতে আচমকাই মনে হল—বুকে হাত রেখে বলছি শঙ্খদা—গাড়িতে আবু না থেকে তুমি যদি থাকতে তবে কী হত? তবে কেমন হত?

গাড়ির ওয়াইপার দুটো ঘন ঘন শুঁড় দোলাচ্ছিল। কাঁচের উপর কট কট বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। কারা সাধছিল, আয় আয়। কারা বলছিল, পালিয়ে যা। গাড়ির কাছে যেতেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। আমি প্রায় লাফিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। গাড়ি মস্ত এক ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল। বাঁক নিয়ে দৌড়ে বড় রাস্তার দিকে ঘুরে গেল।

পুরো ব্যাপারটা আবিষ্কার করার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। ডাইনে ভাল করে তাকিয়ে আমি সত্যিই স্ট্যাচু। স্টিয়ারিং ধরে—আবু নয়—আবুর বাবা। গলা দিয়ে অজান্তে একটা চিৎকার উঠেই থেমে গেল। আমার ডান হাত গলার কাছে। বাঁ হাতে গাড়ির সিট আঁকড়ে ধরলাম। চট করে দরজা খুলে ঝাঁপ দেব কিনা, বিদ্যুৎচমকের মত চিন্তাটা জেগেই মিলিয়ে গেল। আবুর বাবা অত স্পিডের মধ্যেও ঝুঁকে পড়ে আমার দিকের দরজাটা লক্ করে দিলেন। এক ঝলক মদের গন্ধ নাকে এল। কী করি, এখন কী করি?

শিঁটিয়ে গাড়ির মধ্যে বসে আছি। ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে কলকাতা ডোবানো। পাগলের মত ফিয়াটটা দৌড়ুচ্ছে এ রাস্তা ও রাস্তা। লতিফ সাহেব ড্রাইভ করছেন সব কিছু ভুলে। কোথায় যাবেন ঠিক নেই, কেন চলেছেন ঠিক নেই। ওই বৃষ্টিধারার মতই কোনো ঘটনাস্রোতের হাত এড়িয়ে যেন উনি চলে যেতে চাইছেন। যেন কোনো ছিদ্র খুঁজছেন আকাশের গায়ে যার ভিতর দিয়ে উনি পালিয়ে যাবেন সব হিসাবের বাইরে।

একটু একটু করে সাহস ফিরে গেলাম। ঘোর ঘোর ভাবটা কেটে গেল। পুরুষমানুষ যখন পাজ্‌ল্‌ড হয়ে যায়, মেয়েদের কাজই হল ডিসিশন নেওয়া। আমি বললাম, আংকল, সামনের ওই গাড়িবারান্দাটার কাছে দাঁড় করান গাড়িটা। আর কত ঘুরবেন?

চমকে উঠলেন লতিফ সাহেব। আবুর বাবা। কিন্তু কত আলাদা। আবু হলে কথাটা উড়িয়ে দিত। আরও স্পিড দিত গাড়িতে। তর্ক করত। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ এলনা লতিফ সাহেবের কাছ থেকে। গাড়িটা সুবোধ ছেলের মত দাঁড়িয়ে গেল।

ফস করে দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরালেন আবুর বাবা। সমস্ত মুখ ঘামে ভেসে যাচ্ছে। লাল লাল চোখ। বিধ্বস্ত চেহারা মানুষটার। দেখলেই বোঝা যায় লক্ষপতি লোকটা এক কাণাকড়ি সুখের মজুত কোথাও রাখতে পারেনি।

একটু ইতস্তত করে বললাম: আবু...আবু কি আপনাকে...

'ইয়েস, হি টোলড মি এভরিথিং।'

'আপনি ওকে আসতে দিলেন না? বাট হোয়াই ডিড ইউ কাম? সব চেয়ে কি ভাল হত না, যদি আপনারা বাপ ছেলে কেউ না আসতেন?'

'তুমি একলা দাঁড়িয়ে থাকতে।'

'থাকতাম। তাতে কার কী এসে যেত? আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মেয়েমানুষ। আমার জন্য কার কী চিন্তা? হয় আবার মাথা নিচু করে বাড়ি যেতাম বেগিং ফরগিভনেস। না হয় হারিয়ে যেতাম যেভাবে মেয়েরা হারিয়ে যায়। হোয়াই শুড ইউ কেয়ার?'

বিপন্ন মুখ করে তিনি সিগারেট টানতে লাগলেন।

'আবু কোথায়? আপনাকে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি শুয়ে ঘুমোচ্ছে? ও এত কাওয়ার্ড আমি জানতাম না। ক্যালাসনেস ওকে মানায়। অন্য কিছু না। এত ওবিডিয়েনট কবে থেকে হল আবু? আপনি বললেন, সুমন খারাপ মেয়ে, ওকে তোমার ওয়াইফ মানায় না, আর অমনি পিতৃভক্তি উথলে পড়ল আবুর? ইয়েস ড্যাডি। ইউ আর সো রাইট ড্যাডি। এই বলে ও ঘুমোতে গেল? আমাকে একটা ফোন করে জানিয়ে দিল না কেন? কেন আপনি জানালেন না, আবু আমার কাছে ইলোপ করবার পারমিশন চেয়েছিল। আমি দিই নি। হোয়াই?'

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। নিজেকে থামাতে পারছিলাম না। লতিফ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, 'প্লিজ সুমন, লেট মি একস্‌প্লেন। আবু আমাকে নিজে থেকে কিছু বলেনি। আমি ব্যবসা করে খাই। নানাধরণের লোক নানা খবর আমায় এনে দেয়। আমি তোমাদের প্ল্যান মোটামুটি জানতে পেরেছিলাম। আবুর একটা চিঠি আমার হাতে এসে গিয়েছিল। প্লিজ ডোন্‌ট ট্রাই টু নো এভরিথিং। আমি আবুকে হংকং পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ওদিককার বিজনেস ও দেখবে। বিশ্বাস কর, তোমার ওপর আমার কোনো বিরূপতা নেই। কিন্তু আবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে? ইমপসিব্‌ল।'

আমার নারভ্‌স টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। দরজা খুলে আমি নেবে গেলাম। ড্যাম ইউ অল্‌। গো ইয়োর ব্লাসটেড ওয়ে। লিভ মি অ্যালোন। আমাকে রেহাই দাও তোমরা।

লতিফ সাহেব জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরতে চাইলেন। 'লিস্‌ন্‌ সুমন। চল তোমাকে বাড়ি পেঁাছে দি। আমি ভোরের প্লেনে দিল্লি যাচ্ছি। চল পেঁাছে দিয়ে যাই।'

আমি দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। বাড়ি আমার নেই। আমি জাহান্নামে যাব। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমার গাল বেয়ে যা গড়িয়ে পড়ছিল তা হল চোখের জল।

পিছনে কয়েকবার প্রতিবাদ করে গাড়িটা স্টার্ট নিল। তারপর হুস করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি দাঁড়ালাম না। গাড়ি আবার চলে স্পিড কমিয়ে আমার সঙ্গে তাল রাখতে লাগল। আমি তাকালাম না। লতিফ সাহেবের উত্তেজিত গলা শুনলাম। 'সুমন, আই মেনট্ টু স্পেয়ার ইউ সাম পেন। কিন্তু তুমি এত জেদি। দেন, ইফ ইউ মাসট নো, শুনে রাখ। আবু তার মায়ের ছেলে। কিন্তু আমার কেউ নয়। ডু ইউ হিয়ার, হি ইজ নট মাই সান! আই কুডন্ট হ্যাভ ফাদারড এনি বডি!'

আমি বিষম চমকে স্থাণু হয়ে গেলাম। গাড়ি এগিয়ে গেল। তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে দারুণ স্পিডে বেরিয়ে গেল। পথের বাঁকে লালবাতিটা মুছে গেল। ইনজিনের গর্জন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

আমি শূন্যমনে হাঁটতে লাগলাম। ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে। কখনও রাস্তা শুধুই ভেজা। কখনও ময়লা জলের স্রোত গোড়ালি ছাপিয়ে উঠে এল। একবার একটা খোলা হাইড্রানট-এর মুখ পর্যন্ত এসে থমকে গেলাম। হাতে ব্যাগটা ধরা ছিল আলগাভাবে। বেটপ্কা পড়ে গেল জলে। স্রোতের বেগে গিয়ে ঢুকে গেল নালির মধ্যে। ল্যাম্প পোসট-এর ময়লা আলোতে দেখলাম হুহু জল ঢুকে যাচ্ছে কোন্ পাতালে। তোমার সেই নায়াগ্রা ফল্স-এর রঙিন কারডটার কথা মনে এল।

তুমি কত্ত দূরে! তবু তোমার কথা মনে আসতেই আমার শরীরে সাড় ফিরে এল। চমকে উঠে ভাবতে চেষ্টা করলাম কোথায় এসে গেছি, কোন রাস্তায়। তোমাদের বাড়িটা কোন দিকে গেলে মিলবে, আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম।

কী ভাবে তোমাদের বাড়ির দরজায় শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম জানি না। কিন্তু এসে পড়লাম। এখন আর আমার কিছু করার নেই। তখনও রাত কাটেনি। বাড়িটা ঘুমোচ্ছে, ডালে ডালে পাখির বাসা নিয়ে গাছ যেমন-ঘুমোয়। আমি গেটের কাছে বসে পড়লাম। আর দাঁড়াতেও পারছিলাম না।

লতিফ সাহেব ধাঁধার মত যে সব কথা ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন তার একটা ভয়ংকর সমাধান আমার চিন্তায় আবছা ভাবে ধরা দিচ্ছিল। আবু। আবু। কতবার অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে আবুর সঙ্গে খুব চেনা কার যেন মিল আছে। চোখ নাক চিবুক ঘাড়, হাসি, গালে হাত রেখে ফরাসে বসা—বড্ড চেনা চেনা। বড় প্রিয় যেন সেই সব ভংগী।

মনে হল, কাজে কর্মে বাবা কখনও ও বাড়ি যান না। লতিফ সাহেব আসেন না কখনও। দুই মা এবাড়ি ওবাড়ি পাক খান।

খুব ছোটবেলার একটা স্মৃতি মনে এল। আবুর জন্মদিনের পারটিতে কার সঙ্গে খিটিমিটি বাধিয়ে বাড়ি চলে এলাম। মা-ই বলতে গেলে ওই

পারটি দিচ্ছিলেন আবুদের বাড়িতে। একদঙ্গল ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছিলেন। আমার বয়েস তখন কত? পাঁচ কি ছয়!

বাড়ি প্রায় খালি। ভয় পেয়ে দৌড়ে দোতলায় উঠে গেলাম বাবার শোবার ঘরের দিকে। পালংকে বাবা পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন। মেজেতে বসে ফিরোজা আনটি। বাবার দুপায়ে কী সুন্দরভাবে চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাবা তাঁর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমায় দেখে থমকে গেলেন আবুর মা। তারপর বললেন, 'এ কি, তুই না খেয়ে চলে এসেছিস। চল্ আমার সঙ্গে।' বাবাকে বললেন, 'আপনার খাবার ওঘরে রেখে গেলাম।' তারপর আমার হাত ধরে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন।

ছবিটা আমার সামনে দুলতে দুলতে স্থির হয়ে গেল। আমি খুব স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছিলাম। কোথাও কোনো আড়াল আর ছিল না।

নতুন করে আবার যেন দুঃখ যন্ত্রণা সন্দেহ সব মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। সন্দেহ? না, সন্দেহ নয়। সন্দেহ আর কোথাও কিছু নেই। বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। ঘুম পাচ্ছে খুব। তোমার ঘরে শুয়ে, তোমাকেই লিখছি। আর রাত বাড়ছে, বাড়ছে।

পরের সব কথা সংক্ষিপ্ত। তোমার মা আমাকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু আমার সব চেয়ে বড় আশ্রয়, বাবা চলে গেলেন। আমি বিহ্বল হয়ে সব দেখে গেলাম। গোটা কলকাতা বাবার মৃত্যু নিয়ে হই হই করতে লাগল।

তারপর সব থেমে গেল একদিন। এখন আমি বেশীরভাগ সময় তোমাদের বাড়ি থাকি। পরোজকে সকালে পৌঁছে দিয়ে যায় দাদা। নয়তো আমি গিয়ে নিয়ে আসি। আবার ফিরিয়ে রেখে আসি রাত্রে। কখনো রাত্রে নিজের বাড়িতেই থেকে যাই, অন্য বাড়ির মেয়ের মত। আমি এখন চব্বিশ ঘণ্টাই কারও না কারো অতিথি। তালিম নিচ্ছি পরোজ আমি, তোমার মার কাছে। গানের মধ্যে মন ডোবানোর চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, পারব। কখনও ভয় পাই। কী আমার হবে? আবুর মত আবার কি কেউ এসে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে সব আলগা এলোমেলো করে দিয়ে যাবে? আবার কি আমি ভেসে যাব? আই অ্যাম দি গার্ল হু কানট সে 'নো'! আই অ্যাম এ টেরিবল থিং। তুমি কি এদিকে আসবে শঙ্খদা? কবে তুমি আসবে শঙ্খদা? মনে হচ্ছে একটা পাথরের উপর বসে আছি। চারদিকে বন্যার জল ছুটে যাচ্ছে। পাথরটাও যেন আলগা হয়ে আসছে শঙ্খদা। আমার আর করবার কিছু নেই।

সুমন।

চার

রমেনের বাড়িতে পা দিয়েই সুধীশের মনে হল বিয়ে লেগেছে। রমেনের মেয়েব বিয়ে। মুহুর্মুহু ফোন বাজছে। বিশ টাকার সিজন টিকিট আর আছে? নেই। পঁচিশ টাকার? ডেইলি টিকিট কবে থেকে বিক্রী?

চারদিকে লোক গিজ গিজ করছে। গত বছর যারা ভলানটিয়ারি করেছে তারা সব এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে নতুন কয়েকটি ছেলেকে। তারা এবার হাত পাকাবে। তাছাড়া ফি বছর কয়েকটা ছেলে দল থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের রিপ্লেস করতে হবে। কম লোকের তো দরকার হয় না। কলামন্দির বা রবীন্দ্রসদনের আশাররা খুব দক্ষ কর্মী। তবু নিজেদের লোক রাখতেই হয় গেটে, হল-এ। তাছাড়া বিজ্ঞাপনের কাগজ বিলি, ব্লকটক নিয়ে আসা, ছাপাখানায় দৌড়োদৌড়ি, আরটিসট আনা নেওয়া, তাদের তানপুরা সেতার বয়ে আনা, গাড়ি ডাকা, ট্যাকসি ডাকা, স্যুভেনির বিক্রী, স্টেজ সাজানো, চৌকি টেবিল চেয়ার টানাটানি, সতরঞ্জ পাতা—হাজারো কাজ। কাজের কি শেষ আছে?

কালেকটরেট থেকে টিকেট পাশ করিয়ে আনা, ফ্রি টিকিটের অনুমতি আদায়—সে তো এক পর্ব। এটা রমেন নিজেই করে। নয়তো সুধীশ বা মুকুল। কোন্ উপকারে করপোরেশন লাগেন কে জানে। সেখানেও দুশোটি টাকা দক্ষিণা দিয়ে ছাড় আনতে হয়। নইলে আইনতঃ হল্ আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না।

তারপর টিকিট বিক্রী এবং কারড বিলি। সেও কি কম হ্যাপা! সিট অ্যালটমেনট করতে গিয়ে রমেন ফি বছর ইমপোটেনট হয়ে যায়। কে ভাল জায়গা পেল, কে পেল না, তাই নিয়ে ধুন্ধুমার লেগে যায়।

সুধীশ ঢুকেই দেখল জুলফিদার এক নব্যযুবার সঙ্গে কথা বলছে রমেন। 'দেখুন ভাই, এটা তো সাংস্কৃতিক ব্যাপার। এর মধ্যে রাজনীতি টানছেন কেন? পুরোনো ভলানটিয়াররা তো কোনো অন্যায় করেননি। তাদের বাদ দিয়ে আপনার পারটির ছেলেদের নিতে যাব কেন? না না, তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এ কাজটা তারা জানেনা। করতেও পারবে না। বরং ভাল প্রোগ্রাম শুনতে চায়, পাঠিয়ে দেবেন। আমি ঢুকিয়ে দেব। তবে হোল নাইটে নয়। সেদিন একটা আসনও ফাঁকা থাকে না।'

রমেনের নির্দেশে সুধীশ পাশের ঘরে গেল। চেয়ারে এক ভদ্রলোক আর একটি মেয়ে বসে। মুখটা চেনা চেনা। সুধীশ ঢুকতেই দুজনে উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করল মেয়েটি। সবাই বসলেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার মেয়ে অমিয়াকে তো আপনি চেনেন। রেডিও কমপিটিশনে ফারস্ট হয়েছে গেল বার। স্টেশন ডিরেকটর একটা চিঠি লিখে

দিয়েছিলেন। ভাল সেতার বাজায় আমার মেয়ে। রমেনবাবু বলছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

নিশ্বাস ফেললে সুধীশ। এই ঘোর অপ্রিয় কাজটা তাকে প্রতিবার করতে হয়। কিছু লোককে হয় মিথ্যা স্তোক দেওয়া, না হয় রুক্ষ হয়ে তাদের স্বপ্নের প্রাসাদকে চুরমার করে ফেলা। এখনকার সংগীত সম্মেলন একটা ইনডাসট্রিতে পরিণত হতে চলেছে। বড় কঠিন কমপিটিশন। দাঁড়ানর জায়গা নেই।

কর্তাদের ভাষণ শুনলে রাগ ধরে যায় সুধীশের। 'ভারতীয় সভ্যতার ঘনীভূত মূর্তি" ,আবহমান এই মহাদ্যুতিময় দিব্যধারা', 'আমাদের অপরাজেয় প্রাণের সর্বোত্তম বিকাশ'—কত সব সুন্দর সুন্দর কথা উচ্চাংগ সংগীত সম্বন্ধে উচ্চারিত হয়। সত্যি কথাও সব। কিন্তু উচ্চাংগ সংগীতের জন্য কে কী করছে? যত গালই দিক আর কনফারেনসগুলা বলে উপহাসই করুক সমালোচকরা, ওই রমেনরা আছে বলেই সব কিছু চলছে। আজও পাবলিক কনফারেনস হচ্ছে। রমেনরা সতরঞ্জ পাতে বলেই বিলায়েৎ, নিখিল, হালিম-জাফর, আমজাদের পিড়িং পিড়িং; ভীমসেন, কানন, মীরা, শরাফৎ, মুনোয়ার সিদ্ধেশ্বরীর সরগমসাধা; রোশন, বিরজুর তা-থেই-থেই-তা।

মাঝখান থেকে বলি হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার নিরীহ ছাত্রছাত্রী। স্কুলে, কলেজে, গুরুদের বাড়ি গিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় গানবাজনা শিখছে তারা। একটু কোথাও ডাক পাবে, দশজনকে শোনাবে, এইমাত্র আশা। কিন্তু জায়গা কোথায়? ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। বড় বড় বকস্ অফিস শিল্পীরা সব জুড়ে আছেন। কলকাতার কনফারেনস মানে শতকরা নব্বুইটা আরটিসট আসবেন দমদম দিয়ে উড়ে, নয়তো হাওড়া স্টেশনে প্রথম শ্রেণী থেকে নামবেন। তাঁদের সব খাইয়ে-দাইয়ে খুঁদকুড়ো যা থাকবে পাবেন লোকাল আরটিসটরা। নবাগতদের অবস্থা? দেখ ওই ধনীর দুয়ারে, দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে। বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি, কানে তার পশিতেছে আসি। ইত্যাদি

সব কনফারেনসে সব উদ্যোক্তারাই অবশ্য বলেন: 'আমাদের লক্ষ, প্রতিবছর নতুন শিল্পীদের আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করা। এই পবিত্র দায়িত্ব আমরা পালন করবই।' এই সব বকুনির পর যাদের তাঁরা প্রোগ্রাম দেন তাদের চুলে পাক ধরল বলে। হয়তো দশ বছর ধরে রেডিও আরটিসট তারা। এবং অফিস কাছারির দিনে তাদের বসানো হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যখন শ্রোতারা দূরে থাক মশামাছিরাও আসে না। টাইম দেওয়া হবে বড়জোর আধ ঘণ্টা। প্রয়োজন হলে তার থেকেও পাঁচ মিনিট কেটে নেওয়া হবে। আর পারিশ্রমিক? সর্বনাশ। ওই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্যই আপনার একটা আধপাতা বিজ্ঞাপন ফাইন হয়ে যাওয়া উচিত।

শ্রোতারা? তাঁর মুখে বলেন, নতুন আরটিসট কই? সেই থোড়-বড়ি-

খাঁড়া আর খাঁড়া-বড়ি-থোড়! বলেন, সব বাইরের শিল্পী কেন? কলকাতা কি মরে গেছে? অথচ টাকা খরচা করে শুনতে যান বাইরের শিল্পীদেরই। নতুন শিল্পী গান ধরলে ওরা গপ্‌প ফাঁদেন। নয়তো উঠে যাবেন সিগারেট ফুঁকতে, কি চাকফিপান খেতে।

মিউজিক ক্রিটিক? তাঁরা কেউ কেউ সপ্তম স্তরের মানুষ। আড়াইটে প্রোগ্রাম শুনবেন। পাঁচজন শিল্পী সম্বন্ধে লিখবেন। বাকি বাইশ তিরিশজন বাদ যদি যায় সেটা তাদের ব্যাড লাক।

ব্যতিক্রম কি নেই? নিশ্চয় আছেন। নইলে এই গানবাজনার ব্যাপারটা চলছে কী করে? হীনতা যেখানে যতটুকু তা সেখানেই সীমাবদ্ধ। সরস্বতীর আরাধনায় ওইটুকু মন্ত্রোচ্চারণের ত্রুটিমাত্র। পুজো ঠিক ঠিক হয়েই চলেছে। সৎ শ্রোতারা আজও দলে ভারী। ভাল জিনিষ তাঁরা ঠিকই নেন। আর এমন সংগীত সমালোচককে দেখেছে সুধীশ যাঁর জুতো খুলে দিতে পারাও পুণ্যের কাজ।

রমেনের একটা কথা সুধীশের মনে পড়ল। খবর্দার শিল্পীদের, বিশেষত নতুন শিল্পীদের মা-বাবা-স্বামী, ভাই দিদি, কাকা, মামা—এই জাতীয় লোকদের কখনো পাত্তা দেবে না। ওরা হচ্ছে আসল নুইসেনস। চানস পেলেই মাথায় উঠে কথক নাচতে শুরু করবে। তার চেয়ে আরটিসদের ফ্যান সামলানো সোজা। তারা তোমার কাছে বড় জোর ফ্রি টিকিট চাইবে। তারা জ্বালায় আরটিসদের। বাজাতে বসবার পর সই চাইতে যায়। পাগলী মেয়েগুলো টেনেটুনে শারট পানজাবি ছিঁড়ে দেয়। এমনকি চুলও। ময়দানে গাড়িতে মিসেস রঙ্গনাথন আর কুমার ঘনিষঠ বসে ছিল। কয়েকটা মেয়ে গিয়ে মহিলার ব্যাগ নিয়ে তাকেই পেটায়। আর কুমার? 'মাই গড্ রমেন. আই ওয়জ ভারচুয়ালি রেপড্ টু-ডে!'

মুখ তুললো সুধীশ। অমিয়া, অমিয়ার বাবা, তার দিকে তাকিয়ে আছেন। টুইলের হাফশারট পরা, চোখের কোল বসা. অসহায় দৃষ্টি ভদ্রলোকের। কে জানে কত আরাম সুখ সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে হয়েছে এই পরিবারটাকে, যাতে অমিয়ার বাজনা হয়। অমিয়ার শ্যামলা রঙ, ডিমের মত মুখ, কপালে টিপ, নাকের কাছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরণে। কালো চোখের মধ্যে একটা প্রজাপতি কাঁপছে।

সুধীশ বলল, 'আমি কিছুই প্রমিস্ করছি না। তবে চেষ্টা করব। আপনি কাল আমার বাড়িতে সকাল আটটার মধ্যে ফোন করবেন।'

রমেন বললে: 'ব্যস্, তুমি আমার মত না নিয়েই কথা দিয়ে দিলে? কেন, আর কী লোক ছিল না?'

দৃঢ়স্বরে সুধীশ বললে, 'কথা আমি দিইনি। কিন্তু অমিয়া বাজাবে।

টাইম দিতে হবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অন্তত। এবং ওর বাবা গরীব মানুষ। না দিতে পারবেন ডোনেশন, না পারবেন বিজ্ঞাপন এনে দিতে। আমি অমিয়ার বাজনা রেডিওতে শুনেছি। শোনাবার মত বাজনা। ভয় পাবার কারণ নেই।'

সুধীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রমেন তার রাগের মুখে রাশ লাগালে। বললে: 'তুমি যখন বলছ, ঠিক আছে।'

বড় রাস্তার দিকে হেঁটে যাচ্ছে, ট্রাম নেবে। পিছন থেকে ডাক এল, সুধীদা। ফিরে দেখে মহেন্দ্র। পাগলা মহেন্দ্র। পায়ে জন্মাবধি দোষ আছে। খুঁড়িয়ে হাঁটে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। ভাত নিয়ে মা বসে আছেন। মহেন্দ্র কথা শুরু করলে বড্ড বকে। তবু সুধীশ দাঁড়াল।

'সুধীদা, আমি তো রমেনদার কাছে এগুতেই পারছিনে। একটা ব্যাজ পাব না এবার? দেখুন না, গেলবার যোগেন, মান্না, টাবলু ওরা চায়ের পয়সা গণ্ডগোল করল, গাল খেয়ে মরলাম আমি। টাবলু এবার চা সাপলাই থেকে প্রমোশন পেয়ে স্টেজে চলে গেল। আর আমি ব্যাজই পেলাম না। পাড়ায় মেয়েদের কাছে আমার প্রেসটিজ কী হবে আপনিই বলুন। কেউ কি আর পাত্তা দেবে আমায়?'

সুধীশ ট্রামে চেপে চলে যেতে মহেন্দ্র আবার হাঁটতে লাগল। এখন অনেক হাঁটতে হবে তাকে। ব্যাজের কথা বললে বটে সুধীদাকে। তবে সেটা আসল কথা নয়। তার নতুন বান্ধবী টুমপাকে প্রমিস করে ফেলেছে ফ্রি ঢুকিয়ে দেবে, তাকে আর টুম্‌পার তিন বোনকে। কথা দিয়ে ফেলে এখন ঘাবড়ে গেছে। রমেনদা টের পেলে জ্যান্ত কব্বর দিয়ে দেবে। বড় কঠিন জায়গা, উরেশ্‌শালা।

হাঁটতে হাঁটতে শা-পুর চলে এল মহেন্দ্র। আর বেশী দূর নয়। ওই তো অশত্থতলা। শিবলিঙ্গ অর্থাৎ রাস্তার পাথর একটুকরো। বসিয়েছে ফাঁসা হালদার। আর একটু এগিয়ে ইঁটের উপর বসানো পেতলের থালা। তাতে পয়সা। মহেন্দ্র গুণে দেখলে সাতানব্বুই। আর তিনটে হলে পুরো হয়ে যেত। কী আর করা। গোটা চোদ্দ পয়সা রেখে দিয়ে বাকিটা পকেটে পুরলে মহেন্দ্র। থালার কাছে কার্ডবোরডে লেখা: শনিপুজোর জন্যে এইখানে পয়সা দিন।

আবার হাঁটতে লাগল মহেন্দ্র। তারাতলার দিকে। সেখান থেকে যাবে বেহালা। ফেরার পথে বাস নেবে। চলে যাবে খিদিরপুর। তারপর শেয়ালদা মাণিকতলা শ্যামবাজার হয়ে কুমারটুলি। তারপর? পরে ভাবা যাবে। আজ সারাদিন তার পয়সা কালেকশনের দিন। গত শনিবার মোট সাতাত্তর টাকা উঠেছিল। আজ রাত দশটা নাগাদ টের পাওয়া যাবে এ সপ্তাহে কলকাতার লোকগুলো শনিমহারাজকে বেশী বেশী ভক্তি দেখিয়েছে, না কম।

পাগলা মহেন্দ্র আপন মনে হাসলে। ভক্তি, না ভয়? তার অভিজ্ঞতা, শনিকে

নাস্তিকরাও ভয় খায়। নইলে এই যে চোরছ্যাঁচড়ে দেশ ভরে গেছে, এর মধ্যেও দেখ, শনির থালার পয়সায় কোনো শালা হাত দেয় না। স্কুলে সেই ভূগোল স্যার বলেছিল না, লনডনে বাড়ির সামনে সামনে দুধের বোতল, খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে যায়। কেউ চুরি করে না। শুনে মহেন্দ্র বলেছিল, 'লোকগুলো কী বোকা রে!' তা নয়তো কী? নইলে এখন তিন কিলো কাগজ বেচেই তো টুমপাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়া যায়। চাই কি, দুটো মামলেটও ওই সঙ্গে চলতে পারে।

পাঁচ

টিকিটঘর খুলতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। কিন্তু একজন দুজন করে এর মধ্যেই ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে একটা। টিকিট বিক্রীর প্রথম দিনে ভিড় হবেই। বড় বড় অনেক কনফারেনস ডেইলি টিকিট বাজারে ছাড়েন যেদিনেরটা সেদিন। সিজন টিকিট অবশ্য অগ্রিমই বিক্রী হয়। রমেন এই ব্যবস্থা মানে না। তার বক্তব্য, যা আমার টিকিট হাতে আছে সব প্রথমদিন থেকেই শ্রোতাদের সামনে রাখব। যার যেমন খুশী কিনবে। টিকিটের জন্য একই লোককে একাধিক দিন আসতে বাধ্য করব কেন? তাছাড়া সম্মেলনের স্বার্থ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নগদ টাকা হাতে পেয়ে যাওয়া। অভাব তো আসলে ওই নগদ টাকার। যার হাতে যত, সে তত বড় করে, তত কম ঝঞ্ঝাট পুইয়ে কনফারেনস নামাতে পারে।

টিকিটঘরের জানলা বন্ধ। ভিতরে সুধীশ, প্রিয়া এবং সমীর কয়েকজন হুঁশিয়ার ভলানটিয়ার নিয়ে গোছগাছে ব্যস্ত। দাম অনুযায়ী জানলায় জানলায় টিকিট ভাগ করা। ছোট ছোট ক্যাশ বাকসে একশ টাকার খুচরো রাখা। পরিষ্কার লাল নীল পেনসিল নিব কেটে গুছিয়ে দেওয়া। প্রত্যেকটি কাউনটারে হল্-এর চারট্। কমপ্লিমেনটারি টিকিটবই অবশ্য সব রমেনের জিম্মায়। ক্যাশ কাউনটারে আসতেই দেওয়া হয় না ওগুলো, পাছে গোলমাল ঘটে যায়। প্রত্যেকটি চারট্-এ কমপ্লিমেনটারি সিটের, বিক্রী হওয়া সিজন টিকেটের, নমবরগুলো লাল পেনসিলে কাটা।

ফ্লাসক থেকে কফি ঢেলে প্রিয়া আপন হাতে সবাইকে দিলেন। এখন শুধুই কফি। দশটা নাগাদ মিলবে শশা-টোমাটোর পুর দেওয়া স্যানডউইচ। টিকিট বিক্রী শুরু করিয়ে দিয়ে মিসেস রঙ্গনাথন বেরিয়ে যাবেন। টিভোলি কোরট-এ তাঁর ফ্ল্যাটে চলে যাবেন। ফোন করবেন স্বামীকে অফিসে। রাঁধুনীকে রান্নার নির্দেশ দেবেন। তারপর চটপট স্যানডউইচ বানিয়ে, নতুন করে কফি

ফ্লাসকে-ভরে আবার ফিরে আসবেন কলামন্দির। গেটের মুখে ভিড় পেলে—পাওয়াই উচিত—গাড়ি বাইরেই থাকবে।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে চোখ তুলেই সুধীশ দেখল অন্যমনস্কভাবে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন প্রিয়া রঙ্গনাথন। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন আনরিয়্যাল, সুধীশ ভাবল। আমি এদের সঙ্গে কেন? গান গাই না, বাজাই না, সাতকুলে কেউ উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধার ধারে না। রমেন, প্রিয়া, সমীর—এদের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। হ্যাঁ, গান শুনতে ভালবাসি। তাহলে তো ওই জানলার ওপ্যারেই আমার দাঁড়ানো উচিত ছিল। এই ঘরে আমি কেন? দুরু দুরু বুক। কী হয়, কী হয় ভাব। যেন ছাই আমারই মেয়ের, কি বোনের বিয়ে!

প্রিয়া ভাবছিলেন, সুধীশটাও কি আমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে? নো নো, ইট কানট বি। আমি একটা এত বাজে মেয়ে। অথচ আমার স্বামী আমাকে পাগলের মত ভালবাসে। অ্যাবসোলিউটলি, টোটালি, আমার ওপর ডিপেন্ড্ করে। কুমারনাথের মত অত বড় শিল্পী আমাকে ভালবাসে। আপন করে কাছে পেতে চায়। হাউ মাচ ইট উড হারট মি, টু হারট হিম, টু হারম দেম। কী যে করি! কনফাইড করব সুধীশের কাছে? অ্যাডভাইস চাইব? সুধীশ ইজ সাচ এ জেনটেলম্যান।

সমীর ভাবছিল: ওই নচ্ছার মেয়েমানুষটা আর সুধীশটা যে আমার ওপর নজর রাখছে তা যেন আমি বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় রমেন ওদের স্পাই লাগিয়েছে। রমেনটা এক নমবরের হারামজাদা। আরে আমার কি টাকার অভাব যে ক্যাশ থেকে সরাব? এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। হাজার হলেও রমেন ট্রেজারার। ও মাতব্বরী করে করুক। কিন্তু সুধীশ তো অ্যাসিসট্যানট সেক্রেটারী। আর আমি পুরো সেক্রেটারী। ও হুকুম চালায় কীসের জোরে?

সুধীশ বলল, মহেন্দ্র, সবাইকে ব্যাজ পরিয়ে দাও।

মুকুল বললে, সুধীশদা, মহেন্দ্র একটু বাইরে ভিড় দেখতে গেছে।

অন্য দুজন ভলানটিয়ার মুকুলের কথা শুনে মুচকি হাসল। ভিড় নয়, মহেন্দ্র দেখতে গেছে টুম্পারা এসেছে কি না। হোল নাইটে তিন টাকা পাঁচ টাকার টিকিট ফুরিয়ে গেলে বিপদে পড়ে যাবে মহেন্দ্র। তাই আজ টুমপাদের বলে দিয়েছে সকাল সকাল এসে লাইনে দাঁড়াতে। টিকিট ঘরে বসে ভিতর থেকে টিকিট আটকে দেওয়া বরদাস্ত করবে না সুধীশদা।

কলামন্দিরের সামনের ভিড়টা অবশ্য এখনও ঠিক লাইনের আকার নেয় নি। অলস আঙুলে আঁকা জ্যাবরা দাগের মত হয়ে আছে। টিকিট ঘরের জানলা খুললে যদিও সবটাই টান টান ছিলা হয়ে যাবে।

থিয়েটার রোডের ওপারে ফ্ল্যাটবাড়ির জানলা থেকে রমেন ভিড়টা লক্ষ

করছিল। তেতালার এই জানলা থেকে কলামন্দিরের একতলা দোতলার চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়। স্থাপত্য সম্বন্ধে রমেনের অবশ্য কোনো কৌতূহল নেই; এক একটা কোণা থেকে কলামন্দির দেখতে বেশ ভালই লাগে। ওই পর্যন্ত। আপাতত রমেন তার হবু শ্রোতাদের দেখছিল।

পুরোনোরা সবাই রমেনকে চেনে। অনেকেই রমেনের মুখচেনা। এইদিনটা রমেন বেশ ইমোশনাল হয়ে থাকে। টিকিট ঘরের সামনে সম্মেলন কর্তাদের সত্যিকার পরীক্ষা হয়ে যায়। শ্রোতাদের আগ্রহের পরিমাপ করতে পারা যায়। সংগীত মহোৎসবে সবাই নিজেকে দেবতা ভাবে—রথ পথ মূর্তি। শিল্পী, উদ্যোক্তা, শ্রোতা। রমেনের কাছে এইদিন অন্তত শ্রোতারাই বড়। তারা কষ্ট করে আসে নানা দিক থেকে। কষ্টার্জিত পয়সা বের করে টিকিট কাটে। জল ঝড় দাঙ্গা ভূমিকম্প অগ্রাহ্য করে হল্-এ হাজিরা দেয়। এই যে প্রতিবছর রমেন একগাদা টিকিট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ফ্রি বিলি করে, কজন নিয়মিত আসেন? সরকারী বেসরকারী অফিসের বড়কর্তা, মন্ত্রী, মন্ত্রীবাহাদুরদের সচিব, খবরের কাগজের কেষ্টবিষ্টুরা—ভাল সিট না দিলে চটে যাবেন। অথচ নিজেরা না এসে হয়তো পাঠাবেন খাস বেয়ারাকে। তা সে-ও তো ভাল। সিটটা খালি থাকে না! নাচের দিন অবশ্য আলাদা কথা। সেদিন হুড়োহুড়ি। পারলে একে অন্যের কোলে বসে নাচ দেখবেন।

এরা কোথায়, আর কোথায় ওই আগ্রহী শ্রোতারা! তুলনা হয় কোনো? বড়ে গোলাম ঠিকই বলতেন। সরস্বতীর পেয়ারের হাঁস ওরা সব।

ঘড়ি দেখল রমেন। এখনও আধঘণ্টা বাকি। ভিড়টা আরও জমেছে।

টিকিট ঘরের একেবারে সামনে, লাইনের একেবারে প্রথমে যথারীতি দাঁড়িয়ে ছিলেন রমাপতি। রমাপতি বসু। বড় বড় সব কনফারেনস-এ পাবলিক সেল শুরু হবার প্রথম দিনে প্রথম টিকিটটি কাটেন রমাপতি। তারপর ঠাকুর্দার আমলের পুরোনো ওপেল গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরে যান। বাগবাজারের অতি প্রাচীন কায়েত বাড়ির বংশধর। বংশের প্রথম কৃতী পূর্বপুরুষ ছিলেন লর্ড ক্লাইভের অনুগ্রহভাজন। তাঁর শখ ছিল মেমসাহেবের মোজা সংগ্রহ। তখন আর খাস বিলাতিনী কজন? তবু নাকি দুহাজারের উপর তাঁর কালেকশন ছিল। পুরুষসিংহ যাকে বলে! পরবর্তী একজন দুহাতে পয়সা ওড়াতেন ঘড়ির পিছনে। সেই আমলে বোসবাড়ি সর্বক্ষণ টক্ টক্ ঢং ঢং, টুং টাং, শব্দে বিভোর থাকত। রমাপতির প্রপিতামহর সংগ্রহ ছিল দুর্মূল্য সব পোরসিলেনের কাপ প্লেট। হাজার হাজার টাকা খরচা করে কোথা থেকে যে সব সংগ্রহ করতেন! একবার ছোটলাটবাহাদুর আতিথ্য নিলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কাপটা তো ভারী সুন্দর। এটা কি চীনে জেড পাথরের?' প্রপিতামহ গগন-বিহারী বললেন, 'আজ্ঞে না হুজুর। পর্মাপিয়াই শহর লাভার তলা থেকে

খ্ুঁড়ে বার করবার পর একটা সুন্দর স্টোন মেলে। ইতালিয়ান এক কারিগর তা থেকে চারটে সেট কাপ-প্লেট বানায়। একটা যায় পুণ্যাত্মা পোপমহোদয়ের কাছে। একটা কোন্ জারমান রাজপরিবারে। দ্বারবঙ্গের মহারাজ একটা কিনে উপহার দেন তাঁর ফ্রেন্ড অ্যানড ফিলসফার আসামের গুরু ওঁবাবাকে। চতুর্থটা হুজুর আপনার হাতে শোভা পাচ্ছে।'

ছোটলাটের হাত থেকে ঠকাস করে কাপটা যে পড়ে যায়নি তার কারণ হাজার হলেও আসল সাহেব, ফৌজে ছিলেন, স্নায়ুর উপর আয়রন কনট্রোল; কিন্তু বিষম নিশ্চয় খেয়েছিলেন।

রমাপতির ঠাকুর্দা প্রচণ্ড চণ্ডপ্রকৃতির ছিলেন। বাপের সঙ্গে কলহ করে এক রাত্রে সবগুলো দামী কাপ নাচঘরে চমৎকার সাজিয়ে পেচ্ছাপ করে রেখেছিলেন। নিজে এবং কাছেপিঠে সব ভিখিরীদের বাচ্চাদের সাহায্য নিয়ে। পরদিন গগনবিহারী একটি মোক্ষম লাথি মেরে ছেলেকে দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে দিলেন এবং ডানপায়ের দুটি আঙুল ভেঙে শয্যা নিলেন। আর বিপিনবিহারী, অর্থাৎ রমাপতির ঠাকুর্দা, গড়াতে গড়াতে পেঁাছলেন গিয়ে বেনারস। সেখানকার পৈতৃক বাড়িতেই রয়ে গেলেন। বছর খানেকের মাথায় বাপ ছোটবউকে বাচ্চাসমেত পাঠিয়ে দিলেন ছেলের কাছে। নিঃসন্তান বড় বউ—রমাপতির বড় ঠাকুমা--কলকাতায় শ্বশুর গৃহে আমৃত্যু কাটিয়ে দিলেন।

রমাপতির জন্ম এবং ছোটবেলাটা কাটে কাশীতে। ঠাকুমার মৃত্যুর পর ঠাকুর্দা আচমকা বাড়ি ছেড়ে চলে যান হৃষিকেশ। আর ফেরেন নি। বাপ পশুপতি কাশীর বাড়ি বন্ধ করে পাকাপাকি আবার কলকাতা এসে বসলেন; চলে আসবার আগে ঠাকুর্দার পুরানো বাক্সপেঁটরা ঘাঁটতে গিয়ে রমাপতি আবিষ্কার করে শয়ে শয়ে ডারবির টিকিট। লটারিতে বিপিনবিহারী টাকা পেয়েছেন বলে শোনা যায় নি। অথচ কিনে খরচ করেছেন অমন লক্ষ টাকাই হবে।

পশুপতির হবি ছিল পায়রার। গোটা বাহিরমহলটা পায়রার বকম বকমে ভরপুর থাকত। রমাপতি এখনও যেন বাড়ি ঢুকলেই বিষ্ঠার চূণ চূণ গন্ধ পায়। এখন দরদালানে যে কটি পায়রা আছে কোনোটাই শখের পাখি না। উড়ে এসে জুড়ে বসা দেহাতীদের সঙ্গে পেডিগরি পিজিয়নদের অবাধ সংমিশ্রনের ফসল। রমাপতির নিজের হবি উচ্চাঙ্গ সংগীত। মদ মেয়েমানুষ এবং মামলা—এই অত্যন্ত জাগতিক তিন ম-কারের গর্ত দিয়ে বিপুল সম্পত্তির মোটা অংশই গলে বেরিয়ে গেছে। নগদ টাকা যেটুকু যা, রমাপতি তার কায়েত বুদ্ধি খরচ করে ফিক্স্ড ডিপোজিটের ফাঁসে বেঁধে ফেলেছে। সুদ থেকে সংসার চলে যায়। কিন্তু বিলাস ব্যসনের পরিসর সীমিত। মার মুখ চেয়ে

বাড়িতে কীর্তনের আসর বসায় মাঝে মাঝে। আগে ছিল কর্তব্যের তাড়না। এখন মনের ভিতর থেকেই সাড়া আসছে। তৃণশ্যামল দূর্বাকোমল মায়াবী এক অপরূপ প্রেমরসে মজ্জিত হচ্ছে রমাপতি। মদ ছেড়েছে। আমিষ আহারও বাদ দেবে, মাঝে মাঝে ভাবে। আর স্বপ্ন দেখে বাড়িতে একটা জমজমাট মাইফেল বসাবে। সারা ভারত থেকে বড় বড় শিল্পীদের নিয়ে আসবে। কাউকে নগদ টাকা দেবে না। বলবে, আমার খানদানে ওটা অচল। ওটা বর্বরতা। সবাইকে উপহার দেবে হীরা বসানো আংটি বা বোতাম। মহিলা শিল্পীদের দেবে হীরের দুল। এই স্বপ্ন সফল হবার আগেই চলে গেছেন বড়ে গোলাম, আমীর খাঁ, বেগম আখতার, মিঞা করিমুদ্দিন, তারাপদ চক্রবর্তী, অনাথনাথ বসু। আরও কতজন যাবেন। তবু যতদিন রমাপতি নিজে টিঁকে থাকবে, ওই স্বপ্নটাও থেকে যাবে।

রমাপতির কয়েক মানুষ পিছনে জটলা বেঁধে কয়েকটি মেয়ে। আগে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদের বেশ ফারাক করা যেত। এখন আর যায় না। পারুল নামের মেয়েটি বলছিল, দ্যাখ্, তোরা এখনও ঠিক করলি না কে কবে যাবি। শেষে ওই নিয়ে চুলোচুলি করবি। আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি, একটা সিজন টিকিটের পুরো পয়সা দেব, রোজ যাব। আমার টিকিট কেউ চাইবি না।

নীতি বললে, তা তো তুই যাবিই। সেলফিশ জায়েনট কোথাকার। এদিকে আমাদের মিলির রাত্তিরে ছাই ঘুমই হচ্ছে না। ও আমজাদকে দেখতে না পেলে মরেই যাবে। আবার কুমারনাথ কপিল যখন বাজাবে, মাথা ঝাঁকাবে, সামনে চুল ছড়িয়ে যাবে, চোখ খুলে ডিভাইন হাসি হাসবে, তখন ওর চোখে চোখ মেলাতে না পারলে মিলির—

মিলি চাঁটি মারলে নীতির মাথায়। পাজিটা। নিজের গপ্পো আমার ওপর চালাচ্ছিস। কিছু বলি না তাই!

নিরুপমা বললে, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। নীতিকে জানা আছে। সতীকে নিয়ে, ইন্দিরা সিনেমায় কনফারেনস হচ্ছিল না সুরদাসের? তাতে গেছে। অজিত পরেশ ওদের ধরে-টরে তো স্টেজে গিয়ে বসেছে। কনফারেনস শেষ হল। সবাই চলে যাবার মুখে। নীতি সতী আর ফরাস ছেড়ে ওঠে না। কী কান্না দুই বোনের। কনফারেনস ফুরিয়ে গেল। যাঃ। ঠিক যেন বিসর্জনের পর পুজো প্যানডেলে বসে মন খারাপ করা।

একটু পিছনে দাঁড়িয়ে সুব্রত ভাবছিল তিনপাহাড়ের চায়ের স্টলের কথা। এককাপ চা এখন পেলে ফাইন হত। খুব রেলে রেলে ঘুরেছে এককালে। কর্মজীবনের গোড়ায় ছিল ট্র্যাভেলিং সেলসম্যান। আসাম নরথ বেঙ্গল, ওদিকে সাউথ বেহার এবং উড়িষ্যা—এই তিনটে বিটের সব সস্তা হোটেল

তার নখদর্পণে। বাবা তো রেলেরই কর্মী ছিলেন। এককালে প্রায় সব স্টেশনেই সুন্দর চা মিলত। সে সব দিন কবেই অন্তর্হিত হয়েছে। ভাল জিনিষ কিছুই আর থাকছে না। শুধু চা কেন? কি ফারসট ক্লাশ খাবার মিলত রেলের ক্যানটিনগুলোতে। এখন গরাসে গরাসে কটমট। কী পড়ল গো দাঁতে? পাথর? পাথর কেন হবে—পয়সা! পয়সা চিবিয়ে খাচ্ছি।

একবার গেছে সম্বলপুর। খুব ভোরে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে মোড়ের দিকে। সকাল সকাল বাস ধরে বেরিয়ে যাবে। একটা জিপ তার পাশে এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলে, ভাল হোটেল কোনদিকে?

জিপ থেকে ভারী সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক মুখ বের করে বললেন, আপনি বাঙালী না?

নাম শুনল করিমুদ্দিন খাঁ। সঙ্গে একটা যন্ত্র দেখে ভেবেছিল সেতার। পরে জানল তানপুরা। তাতে অবশ্য জ্ঞানগম্যি কিছু বাড়ল যে তা নয়। তবে বড় ভাল লেগে গেল মানুষটাকে। কটকে প্রোগ্রাম সেরে সারারাত ড্রাইভ করে চলে এসেছেন সম্বলপুরে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাত্রে আসতে বুনো জীবজন্তু দেখতে পাবেন, ভরসা দিয়েছিল কারা। এখানকার অরগানাইজাররা জানেও না। কাজেই রিসিভ করবার কেউ নেই। দু-একটা হোটেলে ঢু মেরে ঘর পাননি।

সুব্রত গান বাজনার জগতের কোনো খবরই রাখে না। নইলে ক্যানভাসার-দের মেসে এনে তুলতে সাহসী হত না অত বড় মানুষটাকে। পরে সম্মেলনের কর্মকর্তারা এসে হইচই লাগিয়ে দিল। 'না না, খাঁ সাহেব, আপনার জন্য আমরা হীরাকুঁদের গেস্ট হাউস বুক করে রেখেছি। চলুন সেখানে।' ম্যাজিসট্রেট সাহেব হলেন সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক। তিনি এসে বললেন, 'এ কী? এ তো একটা হভেল! এখানে আপনার থাকা হতে পারে না।'

করিমুদ্দিন সবুজ কাপড়মোড়া ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। বসেই রইলেন। বললেন, আপনারা ঠিক কথা বলছেন না। এতো ফারসট ক্লাস জায়গা। কী সুন্দর টোসট আর চা খেয়েছি সেই ভোরবেলা এসেই। তারপর ওমলেট। আর একঘণ্টা বাদে গরম গরম ভাত, মসুর ডাল আর মাছের ঝোল খাব। পাশের ঘরে গিয়ে দেখুন, সুব্রত বাবু চাকর দিয়ে সব সাফসুতরো করে বিছানা করে দিয়েছেন। গরমজলে চানটি করে নিয়ে খাব আর টুক্ করে ঘুমিয়ে পড়ব। আপনারা সব এখন যান। একেবারে সেই সন্ধ্যের মুখে নিয়ে যেতে আসবেন।

সুব্রত তো বটেই। গোটা মেসের স্থায়ী অস্থায়ী বাসিন্দা সবাই খাঁ সাহেবের তদারকীতে লেগে গেল। কীভাবে সবাইকে যে তিনি আপন করে নিলেন, বন্ধুর মত গল্প করলেন সবার সঙ্গে তা বলার নয়। রাত্রে সবাইকে প্রোগ্রাম শুনতে যাবার নিমন্ত্রণও জানিয়ে গেলেন।

উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে কোনো রুচি ছিল না সুব্রতর। কিন্তু করিমুদ্দিন খাঁর সঙ্গে, সেই হঠাৎ আলাপের পর কৌতূহল একটু জাগল। রেডিও খুলে অন্ততঃ ওঁর গানটা শুনত। তারপর সময়ের ব্যবধানে সবই ধূসর হয়ে এল।

সুব্রত ভাবছিল, এখন আমি কলকাতার বাসিন্দা। খাঁ সাহেব মারাও গেলেন কলকাতায়। অথচ সম্বলপুরে সেই একদিনের আলাপের পর আর যোগাযোগই হল না।

সুব্রতর ঠিক সামনে মাথা ভর্তি টাক এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সুব্রতর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'কী দেখছেন দাদা? আমার টাক? ওটা কিন্তু টাক নয় দাদা—সবটাই আমার কপাল!'

মফঃস্বলের একটা দল খুব গুলতানী করছিল। এরা সবাই হোল্ নাইট শুনতে আসবে। তাই আগেভাগে টিকিট কেটে রাখতে চায়। কলকাতায় যে সব সম্মেলন হয়, সেগুলির হোল নাইট সেশন থেকে সবচেয়ে উপকৃত হয় মফঃস্বলের ছাত্রছাত্রীরা, সংগীতপ্রেমীরা। সব দলে দলে আসেন শ্রীরামপুর, চুঁচড়ো, ব্যানডেল, বর্ধমান. বারাসাত. কৃষ্ণনগর থেকে। এমনকি মালদা, দিনাজপুর, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে। রোজ তো যাতায়াত করা যায় না। সারারাতের আসরে সাধারণতই থাকেন বড় বড় শিল্পীরা। আর হোল নাইট মানে হোটেল খরচ নেই, কলকাতাবাসী আত্মীয়দের উপর চাপ দিতেও হয় না। মফঃস্বলে থেকে গানবাজনা শেখা. অভ্যাস জিইয়ে রাখা যে কত কঠিন. কলকাতার লোক তা কী বুঝবে?

উত্তরবঙ্গ থেকে ভোরবেলার বাসে এসে রাজীব কলকাতা নেমেছে। বগলে অফিসের জরুরী সব ফাইল। রাজীব জানে, সব চেয়ে জরুরী হল তিন নমবর ফাইলটা। তাতে এস-ডি-ও নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন, দিজ ইজ এ মোসট ইমপরটানট ম্যাটার। সেকশন সুপারভাইশার রাজীব মুখুটি ইজ অ্যাডভাইজড টু ডিল উইথ দিজ পারসোন্যালি। লিখে দিয়ে মুচকি হেসে বলেছেন, তাহলে রাজীব, তুমি এবার নিশ্চিন্ত। সোম টু শনি দুপুরে রাইটার্স যাবে। আর রোজ সন্ধ্যায় গানের আসরে। কিন্তু মনে রেখ, কাজটা ইজ রিয়েলি জরুরী। করিয়ে নিয়ে এসো। নইলে এডিএম খেপে যাবে।

রাজীব ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করে। এস-ডি-ও সাহেবকে আড়ালে নিন্দেমন্দ করেছে ভেবে লজ্জা পায়। কাজপাগল রাজীব গানের সিজন এলেই অন্যমানুষ। অফিসশুদ্ধ লোক তা জানে। ছুটিছাঁটা যা নেবার ওই সব সম্মেলনের তারিখ মিলিয়ে। এবার বর্ষার গোড়ায় বেয়াড়া অসুখে পড়ে সব ছুটি কাবার করে দিয়েছে। মহাসম্মেলনের বিজ্ঞাপন আনন্দবাজারে বেরুনো থেকে ওদিকে মন উচাটন। হাসিখুশী মানুষটা মেজাজ বিগড়ে বসে আছে। অধস্তন কেরাণীরা শেষে দলবেঁধে এস-ডি-ও সাহেবকে গিয়ে সব খুলে বলায় চমৎকার ব্যবস্থাটা

হয়ে গেছে। রাজীব এসব জানে না। তার মুখে হাসি ফুটতে দেখে অফিস হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

পাশেই দাঁড়ানো পুরু কাঁচের চশমাপরা প্রিন্সকোট গায়ে চাপানো ভদ্রলোককে রাজীব জিজ্ঞেস করলে, পাঁচতাল্লিশ রুপিয়াকা সিজন টিকিট মিলেগা না?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, হাঁ হাঁ, কিউ নেহী?

বলেই চট করে পান কিনতে চলে গেলেন। ভাবলেন, বাঙ্গালীরা এত বুদ্ধিমান। অথচ হিন্দীটা কিছুতেই শিখবেনা ঠিকঠাক। বড় বড় গাইয়ে। জিন্দগীভর গান গাইছে। উর্দু জবানের ফান্দা অথচ দিমাগে আসবে না।

সিগারেট কিনতে নেমেছিল রমেন। পাশের ভদ্রলোকের দিকে তা‍ি বললে, চণ্ডীবাবু না?

ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। শুখ্‌নো গলায় বললেন, হ্যাঁ। আপনি?

পরিচয় দিয়েই রমেন সরে গেল। চণ্ডীবাবু তাকে চিনবেন না। ১৯৫৭ সালে মহাজাতি সদনে রমেন টিকিট ঘরের প্রথম দায়িত্ব পায়। চণ্ডীবাবু তখন নামকরা গাইয়ে। সদ্য প্রেম করে বিয়ে করেছেন বিখ্যাত নাচিয়ে রমলাকে। ...নেরই তখন খুব রবরবা। চণ্ডীবাবু তাঁর কমপ্লিমেনটারি কারড নিতে এসেছিলেন। রমেন চিনতে পারেনি। কারড দিতে ইতস্তত করায় চণ্ডীবাবু বিষম রেগে গিয়েছিলেন।

পানজর্দা মুখে দিয়ে চণ্ডীবাবু আবার লাইনে ফিরে গেলেন। তাহলে এখনও কেউ কেউ তাকে চেনে। সবাই ভুলে যায়নি। অথচ তিনি নিজে, বলতে গেলে গান ভুলেই গেছেন। বিহারের অখ্যাত এক শহরে একপাল ছাত্রছাত্রীদের গান অবশ্য শেখান। কিন্তু এখন তিনি গানের মাস্টার। গায়ক আর নন।

আর রমলা? তার অবস্থা আরও করুণ। দেহপট সনে শুধু নটই সকলি হারায় না। নর্তকী আরও দ্রুত, আরও নিশ্চিতভাবে দরিদ্র হয়ে যায়। রোশন-কুমারী, বালা সরস্বতী—কজন অমন ভাগ্য করে আসে? কী দাপট ছিল রমলার। বানারসের দুই উঠতি সঙ্গতকারকে আচ্ছা জব্দ করেছিল রমলা। একবার রফিগঞ্জ না পাটনা কোথাকার আসরে কথা কাটাকাটি হতে দুম্ করে বলে বসল, 'অত তড়পাবেন না। ধিরকিট তিরকিট ছাড়া হাতে আছেটা কী আপনার?' আবার অন্য এক আসরে অপর তবলিয়াকে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জানা আছে। অমুক যেমন হাতে ধিরকিট তিরকিট বানিয়েছে, আগে সেটা তুলুন, তারপর চেল্লাতে আসবেন।' শ্রোতারা অবশ্য খুব খুশী। কিন্তু রমলার বন্ধু তবলিয়া মহলে কমে গেল। তার মুখের সামনে দাঁড়াতে পারত না বাঘা বাঘা তবলিয়া। ঘায়েল হয়ে যেত তার লয়কারির চোটে। সেই রমলা দুম

করে ফুরিয়ে গেল।

প্রেমিযুগলের মাঝে ছায়াপাত ঘটাল রমলার সন্তান সম্ভাবনা। আনন্দে অধীর চণ্ডী লক্ষ করল রমলা মনমরা হয়ে থাকছে। তাদের আস্তানা তখন গয়া। ঝি চাকরাণীদের ফুসফাস গুজগুজের ধরণে সন্দেহ হল তার। রমলা সন্তান চায় না। খামাখা ঝগড়া হল একদিন। খুব চেঁচাল রমলা, আরো জোরে আওয়াজ দিল চণ্ডী। ছেলের চেয়ে তোমার নাচ বড় হল?

মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে অপরাধীর মুখ করে রমলা স্বামীকে বললে, সত্যি আমি ছেলে চাইনি। কিন্তু বিশ্বাস কর, নষ্ট করবার চেষ্টাও করিনি। তবু চাইনি তো! ছেলেটো তাই মরে গেল। অভিমান বুকে নিয়ে চলে গেল।

আর নাচল না রমলা। স্বামী ছেলে মেয়ে সংসার নিয়ে রয়ে গেল চুপচাপ। সম্মেলনের জগৎ থেকে আস্তে আস্তে সরে গেলেন চণ্ডী। সরেই ছিলেন। ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে বহু বছর বাদে কলকাতা এসে হঠাৎ ইচ্ছে হল, যাই মহাসম্মেলনের খুব নামডাক। শুনেই আসি। কিন্তু এই মুহূর্তে, রমেনকে দেখে, যদিও তার নামও তিনি ঠিক জানেন না, তাঁর সব বাসনা উড়ে গেল। ধুৎ, আমি এখানে কেন? আমার বড় ছেলে পাটনা ইউনিভারসিটিতে পড়ায়। মেজ ছেলে কনট্রাকটার। ছোটটা পড়ে গয়া কলেজে। মেয়ে থাকে পুর্ণিয়া। জামাই ব্যবসা করে, হোলসেল এজেন্ট কিসের কিসের যেন। বউ একদা নাচত। আমি গানের মাস্টার।

রমেন দাঁড়িয়ে দেখল চণ্ডীবাবু সারকুলার রোডের দিকে চলে যাচ্ছেন মাথা নিচু করে। ইচ্ছে হল তাঁকে আটকায়। সাহস হল না। বড্ড মুডি ছিলেন চণ্ডীবাবু!

সেই ১৯৫৭ সালের মহাজাতিসদন। মনে পড়ল রমেনের। এখনকার তুলনায় তখন টিকিটের হার বেশীই ছিল। তবু দারুণ ভিড় হত। উত্তেজনায় গম গম করত হল। শ্রোতারা সবাই সারাক্ষণ যেন আশায় আশায় থাকত। এই এখুনি বড় কিছু একটা ঘটবে। বিরাট বিরাট শিল্পী ছিলেন সব। রাজা মহারাজের মত সব চালচলন। মনে আছে শুধু একশ টাকার ছাড়া আর কোনো টিকিট নেই বলায় টিকিট ঘরের সামনে কী গণ্ডগোল। সব টিকিট ব্ল্যাক করা হয়েছে, এই ধুয়া তুলে একদল লোক শুয়ে পড়ল গেটের সামনে। কাউকে ঢুকতে দেবে না ভিতরে। তাদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যারা তবু গান শুনতে গেল তাদের উদ্দেশে বিকট 'শেম' 'শেম' ধ্বনি উঠল। পরে রাত দুটোর সময়ে রমেন দেখেছে বাইরে টাঙানো মাইকের কাছে বসে ধুলিধুসর দেহ ওই সত্যাগ্রহীরাই হাসিমুখে গান বাজনা শুনছে। খুরিতে করে চা খাচ্ছে। নতুন উঁচু পাওয়ারের বাল্ব বসেছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ জুড়ে। সেই আলোয় ময়লা কমদামী আলোয়ানগুলো ম্যাটম্যাট করছে। চাদরে কানমাথা ঢাকা

ঝাঁটাগোঁফ একটা আধবুড়ো সুরুৎ সুরুৎ করে ধোঁয়াওঠা চা খাচ্ছে—এই ছবিটা রমেনের মনে গাঁথা হয়ে আছে।

আর তারও আগে? ভারতী সিনেমার সামনে কী জমায়েত। যেন এখুনি নেহরু বা নেতাজী বক্তৃতা দেবেন। খবরের কাগজ পেতে ফুটপাথে, পরে ফুটপাথ ছাপিয়ে রাস্তায় সব বসে গেল। বন্ধ হয়ে গেল ট্রাম বাস সমস্ত। সারা রাত্রি একটা উৎসবের আবহাওয়া। ডোভার লেনের জলসায় বা চৌরঙ্গীর উপর যেবার সদারঙ্গ কনফারেনস হল—সেখানেও ভিড় আর ভিড়। বাইরে মাইক তুলে দেওয়াটা মস্ত ভুল হয়েছে। কারা আপত্তি তুলেছিল রমেন ঠিক জানে না। হয়তো পুলিশ কর্তৃপক্ষ। হয়তো বা বিনি পয়সায় কেন উট্‌কো লোকদের গান শোনাব—এই মনোভাবের বশে সম্মেলনের উদ্যোক্তারাই। কিন্তু যারাই করুক, ভুল করেছে। ওই জনতা বিরাট পাবলিসিটি করে দিত উচ্চাঙ্গ সংগীতের। সাধে আধুনিক গানের আসরের চেয়েও পপুলার হয়েছিল তখনকার পাবলিক কনফারেনস? অমনি অমনি কি আর হাউসের বাইরের শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করতেন পণ্ডিত ওঁঙ্কারনাথ, উস্তাদ বড়ে গোলাম, স্টেজ থেকে—আপনারা সবাই ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছেন তো?

টিকিটঘরে বসে চণ্ডীবাবুকে নিয়ে যে ফ্যাসাদ হয়েছিল, সেইদিনই একটা মজার কাণ্ডও ঘটেছিল। সিল্কের পানজাবির উপর দামী শাল চাপানো টুপি পরা এক দশাসই মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এসে হাজির। পিছল-কালো গায়ের রঙ্, প্রতি আঙুলে আংটি। বললেন, আরটিস্‌ট লিস্‌টটা কী শুনি। রমেন বললে, ওঁঙ্কারনাথ গাইবেন। ভদ্রলোক মুখ বাঁকিয়ে বললেন, ফুঃ, ও আবার গায়ক? রমেন ইতস্তত করে বললে, বিলায়েৎ বাজাবেন। তিনি নাক সিঁটকে বললেন ছ্যা ছ্যা, ও কি সেতার বাজনা? রমেন রেগে বললে, উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি—উনি ভুরু নাচিয়ে বললেন, সিয়ারাম সিয়ারাম, ওর তো গলায় ডিফেকট। আসল গান শুনতে চাও? তবে শোনো। খাস লাখনাউ-এর চিজ্ জিন্নৎ বাঈজীর কাছে শোনাও বলতে পার, শেখাও বলতে পার।

বলেই মোটা শরীর দুলিয়ে, ভাও বাৎলিয়ে, হেঁড়ে গলায় গান গাইলেন: শাঁওরিয়া শাঁওরিয়া শাঁওরিয়া রে, কঙ্গ মোর নজরিয়া। ইধার গঙ্গা, উধার যমুনা। ময় তো খঁড়ে ফিরি গাগরিয়া লে, কঙ্গ মোরি নজরিয়া।

বাপ্‌স। কী গান। হঠাৎই আবার গান থামিয়ে ভদ্রলোক একগোছা একশ টাকার নোট ফেলে দিলেন কাউনটারে। রমেন গুণে বলল, সাতশ। ভদ্রলোক বললেন, তোমাকে গুণতে বলিনি। নোট গোণার জন্য আমার তিনটে মুনিম আছে। সাতটা টিকিট দাও।

নটা বাজতে দু মিনিট বাকি। রমেন ফিরে এল তেতালার ফ্ল্যাটে তার দর্শকের আসনে। ভিড়টা টিকিটঘরের জানলার কাছে নিজেকে গুছিয়ে

নিয়েছে। লাইন সোজা হতে হতে বেরিয়ে এসেছে গেট অবধি। আরো বাড়বে।

ডাইনে তাকিয়ে ছাই রঙের ফিয়াট গাড়িটা আচমকা দেখে ফেলল রমেন। এখান থেকে চালকের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। থুৎনি পর্যন্ত নজরে আসছে। সিগারেট ঝুলছে ঠোঁটের কোণা থেকে। সবুজ-চকোলেট মেশানো সোয়েটার গায়ে। স্টিয়ারিঙের ওপর দুটো হাত। আঙ্গুল কটা অন্যমনস্ক ভাবে ট্যাপ করছে কালো স্টিয়ারিং। নাক চোখ মুখ, বা মাথার উপর টাকটা না দেখতে পেলেও মানুষটাকে চিনতে পারল রমেন। এ তো শিল্পপতি লতিফ সাহেব। অবাক হল রমেন। গান বাজনার ধারে কাছে দেখা যায় না লতিফ সাহেবকে। আজ হঠাৎ এখানে কেন? এসেছেন যদি, নামছেন না কেন?

হঠাৎ রমেন চমকে গেল। কাছে পিঠে অনেকগুলো কুকুর কান্না জুড়েছে না? পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গল। কুকুরের ডাক নয়, সাইরেন। নটা বাজল।

টিকিট ঘরের জানলা খুলে গেল ঝপ করে। চঞ্চল হয়ে উঠল ভিড়টা। রমেন চোখ মুদে গণেশকে প্রণাম করতে গেল। অন্ধকার চোখের পর্দায় ভেসে উঠল বিরাট বিশাল লাল টকটকে একটা জিভ। মা কালীর জিভ।

ছয়

উদ্বোধন হয়ে যেতে গণ্যমান্য অতিথিদের আসনে বসিয়ে দিয়ে রমেন বাইরে এল। সামনে সাইডের সীটে গোটাকয় বুড়ো বসে। পাঁড় মিউজিক রসিক। কিন্তু বসে কেবল ঢুলবে। একজনের নাক দিয়ে নস্যমেশান সর্দি গড়াচ্ছে। প্রত্যেকবার রমেন ভাবে এদের আর ফ্রি টিকিট দেবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। আফটার অল, ওই যে নবনীবাবু, লোকটা পৈতৃক সম্পত্তি ফুঁকে দিয়েছে—রেস খেলে নয়, মেয়েমানুষ বা মদে নয়—গানের পিছনে। টিকিট না দিলে চাদর দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে স্টেজে ঢুকে যাবেন ঠিক। ভাবতেই রমেন লজ্জা পায়। এমনকি রমেনও লজ্জা পায়। সামনের বছর, রমেন ভাবে, ওদের কম দামী সীট দিতে হবে!

মিসেস রঙ্গনাথনের গাড়ি বাঁদিকে পারক করা। রমেন গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্টেজে সুধীশ আছে। চিন্তা নেই অতএব। ঘড়ির মত সব চলবে।

মিসেস রঙ্গনাথন বেরিয়ে এলেন। রমেনকে ওখানে দেখে ভুরুতে তার প্রশ্ন উৎকীর্ণ হল।

রমেন বলল: 'দেখুন, কী ব্যাপার চলছে আমায় একটু বলবেন?'

'কীসের কী ব্যাপার?'

'প্রথম ধরুন আপনি। আপনি কুমারকে কেন চিঠি দেননি? ভার তো আপনি নিয়েছিলেন? কুমার করিমুদ্দিনের কত বড় বন্ধু ছিল আর কেউ না জানুক আপনি তো জানেন। ও যদি নিজে থেকে আমায় ফোন না করত দিললি থেকে, আমি তো জানতেই পারতাম না!'

'যদি বলি এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার?'

'কুমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু আপনি তো আমাদের সেক্রেটারী! তারপর ধরুন, আজ কুমার এল। বরাবর দমদম যান আপনি, আপনাদের বাড়িতেই ওঠে ও। এবার জানা সত্ত্বেও আপনি গেলেন না। কাউকে পাঠালেনও না—

'রমেনবাবু, আমি যাই নি কিন্তু প্রতাপ সিং গিয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে কুমার কলকাতার বিশটা বাড়িতে উঠতে পারত। ও নিজেই গিয়ে উঠল ইনটার ন্যাশনালে। আর, আবার বলছি, ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। নাক গলাতে আসবেন না।'

'বেশ গলাব না। কিন্তু এই প্রথম কুমার কলকাতা পেঁাছেও ওপনিং সেরিমোনিতে জয়েন করল না। গাড়ি পাঠিয়েছিলাম। ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ শেষ আইটেম ওর। বাজাবে তো?'

'প্লিজ ফাইনড আউট ফর ইয়োরসেলভস। হোয়াই বদার মি?'

রমেন একটু দম নিলে। তারপর বললে: 'ঠিক আছে। কিন্তু অন্য একটা প্রবলেম নিয়ে আমি আপাতত চিন্তিত। ক্যাশ টাকা প্রেসিডেনট যা দেবেন বলেছিলেন তার হাফ ঠেকিয়েই সেরে দিয়েছেন। ফরচুনেটলি আজ খরচা বেশী নেই। আঁখিদেবী কোনো পয়সা নেবেন না। আর কুমারও না। ওর হোটেল আর প্লেন, সে পরে দিলেও হবে। কিন্তু এর পর কী হবে?'

'কেন, ব্যাংক কি খালি?'

'আপনি কী অ্যাডভাইস করেন। ব্যাংক থেকে কাল তুলে নেব?'

মিসেস রঙ্গনাথন হঠাৎ বললেন: 'রমেনবাবু, প্লিজ। আজ আমার মনটা একদম ভাল নেই। যা ভাল হয় আপনি করুন। কাল আমি দেখব শুনব। আজ ছেড়ে দিন।'

রমেন বললে, 'সরি'। তারপর রাস্তা পেরিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বললে, 'পাঁচু, এক খুরি চা দে চটপট।' রমেন ভাবল: রামকিষেণ আর অবনী পাল মিলে যে আলাদা একটা সংস্থা খুলতে চাইছে সে খবরটা এমনকি মুরারিদাও রাখে। অথচ ভাইটালি অ্যাফেকটেড যে মিসেস রঙ্গনাথন, তিনি জানেন না। তিনি আছেন মেয়েলি মান অভিমান নিয়ে। বীচ দ্যাট শি ইজ।

এর মধ্যেই ট্যাকসি থেকে নামল ললিতা। রমেনের বউ। বড় শান্ত মহিলা। আদ্দেক লোক তাকে চেনেই না। স্বামীকে দেখে হাসল ললিতা। রমেন এগিয়ে

গিয়ে ট্যাকসি ভাড়া মিটিয়ে দিলে। বললে: যাও বোসো গিয়ে। আমি পরে আসছি।

ললিতা কিছু না বলে মুখে হাসিটা ফুটিয়ে রাখল। তার পাশে একটা সীট থাকে ঠিকই। কিন্তু সেটা ফাঁকাই থেকে যায়। বসবার সময় কই রমেনের?

সাত

তিনবার পড়া চিঠিটা আবার পড়ল কুমার। ছোট চিঠি।

'কুমার, আমায় ক্ষমা কোরো! তোমাকে তো একদিন সব দিয়েছি। যা চেয়েছ, যা চাওনি—সব? তবে আজ আমার অক্ষমতা ক্ষমা কোরো। তোমাকে কেন ভালবেসেছিলাম জানিনা। আজ কেন ভালবাসিনা—অর্থাৎ কমাস আগের মত ভালবাসিনা—জানিনা। কিন্তু জানি, দুটোই সত্য। আমি চাই নি তুমি আস। তবু তুমি এলে। ভালই করেছ। করিমুদ্দিন তোমার বন্ধু ছিল। কিন্তু আমি দূরে সরে যেতে চাই। যেতে দাও। সাঁইবাবার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পেরেছেন। তিনি মুখে কিছু বলেননি। চোখ দিয়ে বলেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি। আমি দুর্বল। কিন্তু দুর্বলতা জয় করবার চেষ্টায় আছি। তুমি সাহায্য কর। প্রিয়া।'

কুমার কখনো বাজনার আগে ড্রিংক করেন না। আজ সারা দিন করছেন। না, প্রিয়া তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বলেই নয়। দমদমেই তিনি বুঝেছেন প্রতাপ সিংকে দেখে। চিঠিটা তো এই এল। কুমার হঠাৎ কেমন নারভ হারিয়ে ফেলেছেন। যেন তার কোনো অবলম্বন নেই। টগরের মৃত্যু তাকে অবশ করে দিয়েছে! এইতো সেদিন বোমবাই মাইশোর দেখা হল। অথচ মানুষটা কেমন নিঃশব্দে চলে গেল। কোথায় গেল? এত কষ্ট করে অত সাধনায় সারা জীবন যা শিখল, যত কঠিন কঠিন কাজ তুললো গলায়, সব খতম? তবে কেন এত লড়াই? কার জন্য?

কলকাতাই যেন বদলে গেছে। না এলেই হত। চোখ বন্ধ করে টগর চলে যাচ্ছে মাটির তলে। এই ছবিটাই তাকে ক্রমাগত অস্থির করে রেখেছে। রাহে রাহ যো আদমকো মিল জায়ে, টুক রোখ উসে হাম পুছেঙ্গে, কিঁউ আঁখে মুঁদে জাতেহো, ক্যা জানাবুঝা রাস্তা হৈ? মৃত্যুর অন্ধকারে কী করে নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে চলে যাচ্ছ হে বিদায়ী পথিক? অচেনা রাস্তায় চোখ খুলে যেতেও যে আমাদের বুক কাঁপে? তবে কি, তবে কি, যে পথে তুমি চলেছ সেই পথ তোমার চেনা?

পাত্রে আবার হুইসকি ঢাললেন কুমারনাথ কপিল।

আর গ্লাসের বুড়বুড়িকাটা তরল আয়নায় ও কার মুখ, কার মুখ, ভেসে উঠল?

রবীন্দ্র সদনে ফাংশন হচ্ছে। টগর গাইবে। স্টেজে ঢুকে গেলেন কুমারনাথ। এদরজা ওদরজা পার হয়ে উইংগস্-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। পর্দা তখনও ফেলা। কিন্তু আসরে উঠে বসে গেছেন করিমুদ্দিন। তানপুরা মেলানো হচ্ছে। মাইক সাজানো চলছে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা একজন কী যেন বলছেন উস্তাদকে। ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ছে টগরের। ওরই মধ্যে হঠাৎ কুমারকে দেখে ফেললেন টগর। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আদাব জানালেন। স্টেজের উপর চলে এলেন কুমারনাথ। আর তিনি সপ্রতিভ চরণে টপ করে নেমে পড়লেন চৌকি থেকে। দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন কুমারকে বুকে।

এবং পরক্ষণেই কানে ফিস ফিস করে বললেন, আমার বাঁ দিকে যে মেয়েটা বসে আছে ওকে যে করে পার হাটাও। ও থাকলে, বিসমিল্লার কসম, আমার গান 'তাবা' হয়ে যাবে। গ্রীনরুমে একঘণ্টা ছিল। আমি, কী বলব, এত তক্‌লিফ হচ্ছিল আমার...গানে মন দিতে পারছিলাম না। চোখ দুটো বারে বারে ওর দিকে—

প্রিয়া রঙ্গনাথন। সদ্য বিলাত থেকে ফিরেছেন। স্বামী ছিলেন ইয়োরোপে দু-বছর ডেপুটেশনে। প্রিয়া পাকা মেমসাহেবটি হয়ে ফিরেছেন। রবীন্দ্র সদনে প্রথম হটপ্যান্ট পরে গানের আসরে হাজিরা দেবার রেকর্ড নিশ্চিতভাবে প্রিয়ার। সবারই দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে প্রিয়া ফরাসের একপ্রান্তে কণ্টেসৃষ্টে বসে ছিলেন। কুমারনাথও তাকে দেখে চমকে গেলেন। করেছে কী মেয়েটা। এ যে পুরুষ জবাই করা কাণ্ডকারখানা। অমন ফিগার! টগরের তক্‌লিফ কেন হচ্ছিল বুঝতে কষ্ট হয় না।

কুমারনাথ এগিয়ে গিয়ে বললেন, মাদাম, খাঁ সাহেবের অতিথি আপনি। এখানে কষ্ট করে না বসে, চলুন অডিটোরিয়মে যাই। ওখান থেকে ভাল শোনা যাবে।

এককথায় উঠে পড়লেন প্রিয়া। আঁট পোষাকে বসতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছিল। অডিটোরিয়মের ঠাণ্ডা অন্ধকারে, নাড়িশিরায় দ্রুত সঞ্চলিত রক্ত স্রোত সামলানোর চেষ্টা করতে করতে, নেশাগ্রস্ত আদিম মানুষটি হয়ে, কুমারনাথ প্রিয়া রঙ্গনাথনকে পাশে নিয়ে বসে রইলেন। টগরের গলা তার কানে পৌঁছল। হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারল না।

সেই শুরু। তারপর কেমন করে কথা আর গানে মাখামাখি হল, একজনের রক্তে আরেকজনের রক্ত গিয়ে মিশল, দিনরাত্রি সম্পূর্ণ বল্‌গাহীন মাতাল হয়ে গেল, কে তার হিসাব রেখেছে? কে কবে তার হিসাব রাখতে পারে? প্রথম বয়সের ভালবাসা, মেঘভরা আকাশ। মধ্যবয়সের প্রেম, প্লাবিত নদী। সব

যায়, সব ভেসে যায়।

তারপর?

তারপর কী? বন্যার জল সরে গেলে হাঁটুডোবা কাদা? প্রিয়া একদিন নিজেই সব আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে বলেছিল: নাও, আমাকে নাও। আর আজ স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছে দূরে। নিজের হাতে খিলটি তুলে দিয়ে—অন্য ঘরে নয়, অন্য জগতেই চলে যেতে চাইছে।

মুখ থেকে গ্লাস নামিয়ে রেখে হেসে উঠলেন কুমারনাথ। আর কোনও গ্লানি নেই। যাও, প্রিয়া, যাও। যাও, যেখানে তোমার শান্তি।

প্রিয় একটা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন কুমারনাথ কপিল।

বসন্তের অধিকার দিলে না আমাকে/দিলে না ইতিহাস তৈরির স্বর্ণিল সুযোগ/আমার আত্মা. দ্যুত আলো, ছড়ালো কুড়োলো অনেক কুর্চি ফুল, অনেক কুন্দফুলের শুভ্রতা/অমোঘ তোমার অনুশাসন, তোমার আঙুল/চন্দনের ফোঁটা পরালো না এ ললাটে/জীবন তাই বেদনার ধূধূ মরু আদিগন্ত।

রক্তে তোমার রক্ত মিশল যার/সে তো আমি নই, সে তো আমি নই /স্বাক্ষর ছিল ও মনের উপর/জলে অংকপাতের মত তা কি মুছে গেল?/দেহের দাগ জানি মিলায় না, মিলায় না।

সেদিনের পর/তবু তুমি তুমি নও, আমি শুধু আমি নই/ইতিহাস সাক্ষী/যদিও পেলেম না বসন্তের অধিকার/আর পেলেম না ইতিবৃত্ত রচনার স্বর্ণিল সুযোগ।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কুমারনাথ। তাঁর পা টলছিল। মন স্থির জলের আয়না।

আট

ফরাসের উপর একলা বসেছিলেন চন্দ্রজিৎ। চতুর্দিকে ব্যস্ততার আভাস পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু এদিকটা ফাঁকা। ভলাণ্টিয়াররা ট্যাকসি থেকে তাঁর তবলার ব্যাগ নামিয়ে পেঁৗছে দিয়ে গেছে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে কেউ না কেউ। এ ব্যাপারে রমেন অত্যন্ত উদার। অ্যাডভান্সের সঙ্গে ট্যাকসিভাড়া বাবদ গোটা দশেক টাকা গছিয়ে দেবেই। অথচ ভলাণ্টিয়ারদের উপর কড়া নির্দেশ জারী করা আছে—খবরদার, আমার কোনো আরটিস্ট যেন পকেট থেকে পয়সা বের করার সুযোগ না পায়। গাড়ি খালি থাকলে ফেরবার সময় যেন লিফট পায় ছোটবড় সব শিল্পী। নয়তো ট্যাকসি ডাকিয়ে এনে ভলানটিয়াররা

নিজেরাই কেউ সঙ্গে চলে যায়। কাছে পিঠে কেউ না থাকলে যন্ত্রের বাকস নিজেই বয়ে দেয় রমেন। শিল্পীদের সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে। বলে, ইয়ে তো মেরা ভাগ হ্যায়।

কলামন্দিরের গ্রীণরুমে গেলে চন্দ্রজিতের মনে হয় যেন জাহাজের খোলে ঢুকেছে। বেসমেনটের লম্বা প্যাসেজ, দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছে, পাশে পাশে সব ঘর। ছোট ছোট ঘর। মেজেতে শতরঞ্জ। তার ওপর টান করে পরিষ্কার শাদা চাদর পাতা। ফুলদানিতে টাটকা ফুল। এগুলো মিসেস রঙ্গনাথনের টাচ্। অনেক ফাংশনে চাদর প্রথমদিকে ফরসা থাকে। তারপর চরণধুলোয় ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে যায়। লোকজনও তেমনি। চুণ মোছে। পানের দাগ, চা সব ফেলে। হয়তো নাকও ঝেড়ে নেয়, কে জানে। সিগারেট দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। দেখলে গা ঘিন ঘিন। বসতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু প্রিয়া দেবীর ব্যবস্থাপনায় ওসব হবার যো নেই। রোজ ধোওয়া চাদর পেতে দিয়ে যায় ডেকরেটরের লোক। এতটুকু ছেঁড়া ফাটা বা ময়লার চিহ্ন কোনরকম থাকলে রক্ষা নেই। 'ভারতী ডেকরেটর্স জেনারেল অরডার সাপ্লায়ারস কাম কেটারিং একসপারটস্ঃ দোকানের সোল প্রো: প্রবোধ নস্কর (সম্প্রতি নেপাল ঘুরে আসবার পর লেখেন ফোরেন রিটারন্‌ড্) হন্তদন্ত দৌড়ে এসে ক্ষমাটমা চেয়ে প্রিয়া রঙ্গনাথনকে ঠান্ডা করেন। ঘনিষ্ঠ মহলে রমেন বলে: বাপ্‌স। ভাগ্যে মেয়েছেলেটার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হয় না। নইলে, স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে করতে মরে যেতাম মাইরি! কম সে কম দাঁত তো মাজতেই হত রোজ রাত্তিরে।

সুধীশ খুব আদর যত্ন করে বসিয়ে গেছে। 'আসুন চন্দরদা। বসুন। কুমারনাথ আসেননি এখনও। বসুন। চা টা পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে অডিটো-রিয়ামে এসেও বসতে পারেন। যা ইচ্ছে। কতদিন বাদে আবার আপনি বাজাচ্ছেন। সবাই খুব একসাইটেড হয়ে আছে।'

চন্দ্রজিৎ বসলেন। অন্যমনস্কভাবে চায়ের জন্য অপেক্ষা করলেন কিছুক্ষণ। তবলার ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালেন। আবার গুটিয়ে নিলেন। ব্যাগ থেকে টেনেটুনে যন্ত্র বের করার অভ্যেশ বহুদিন নেই। চেলারা থাকে চারপাশে। হাঁ হাঁ করে এসে পড়ে সব। তারাই সব গুছিয়ে সামনে ধরে দেয়। পরিষ্কার বিড়ের উপর বসিয়ে দেয় তবলা বাঁয়া। ঝকঝকে স্টিলের হাতুড়ি রাখে সামনে। আর পাউডারের কাঠের কৌটো। ত্রিপুরায় প্রোগ্রাম করতে গিয়ে উপহার পেয়েছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শচীনবাবুর কাছে। বেশ গন্ধওলা পাউডার ব্যবহার করার ঝোঁক চন্দ্রজিতের। যশোমতী নিজের হাতে কৌটোয় ভরে দিতেন আপন স্টক থেকে। এখন কোথায় যশোমতী, আর কোথায় চ্যালাচামুণ্ডারা সব? কাঠের কৌটোটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। আছে হয়তো বাড়িতেই,

দশটা জিনিষের আড়ালে। কে দেখে দেয়? শেষমেষ একটা ওষুধের খালি কৌটো করে যেমন তেমন পাউডার ভরে চলে এসেছেন হলে। একমাত্র সঙ্গী, দীর্ঘদিনের বন্ধু বিষ্ণু। পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। পরে আসবে। শেয়ালদার কাছে একটা টিউশনি সেরে।

'কতদিন বাদে আবার আপনি বাজাচ্ছেন। সবাই খুব একসাইটেড হয়ে আছে।'—সুধীশের এই কথাগুলো—খুবই আন্তরিক নিশ্চয়—চন্দ্রজিতের মেরুদণ্ডে বরফ ঢেলে দিল। তাড়াতাড়ি পানদানটা টেনে নিলেন নিজের কাছে। পান সাজতে বসে গেলেন।

ভেজা কাপড়ে জড়ানো পুণাপাত্তির গোছ। এক মারাঠী দোস্ত সংগ্রহ করে দেয় তাঁকে। যখন ইয়োরোপ আমেরিকা করে বেড়াতেন, তখনও সাধ্যমত পানের যোগান দিয়ে গেছে চন্দ্রজিৎকে। বন্ধুতার নানাভাবে প্রকাশ চন্দ্রজিৎ সারা জীবন দেখেছেন। বন্ধুরা আছে বলেই এই ভেজালের যুগেও দুনিয়া চলছে। বড়াই করে যে বলে সে 'অনৃণী' তার কথায় থুক্ ফেলে দেন চন্দ্রজিৎ। ঋণ না রেখে দুনিয়ায় কে চলতে পারে? ইন্‌সান পারে না। ইবলিশের বাচ্চারা হয়তো বা পারে।

চন্দ্রজিতের গুরু বব্বন খাঁ দিল-ই-দোস্ত ছিলেন থেরকুয়া সাহেবের। মারা যান, তখন বয়স কত? নিজে বলতেন আমার বয়স তিরিশ চল্লিশ হবে। আসলে এই সব উস্তাদের কখনও বয়সের হিসেব থাকেনা। কেউ বলেন কমিয়ে, ভয়ে ভয়ে মৃত্যুকে দূরে রেখে। কেউ দুমদাম বাড়িয়ে বলেন। ভাবেন, তাতেই সম্ভ্রম বৃদ্ধি। না, তিরিশ চল্লিশ নয়। পঞ্চাশ হবেই। এমন সুন্দর শরীরের গাঁথুনি ছিল যে অনেক কম মনে হত। যাহোক, বব্বন খাঁ বাজারে বিস্তর লোককে টাকা ধার দিয়ে রেখেছিলেন। নিজেও কিছু লোকের কাছে টাকা ধারতেন। তাঁর ধার করার মধ্যেও মজা ছিল।

একবার তিনি, কিশোর চন্দ্রজিৎ তখন ছায়ার মত উস্তাদের পিছনে ঘুরছে, আমেদাবাদ গিয়ে উঠলেন ডঃ নীলকান্ত যোশীর বাড়িতে। যোশীজীর বীণের শখ ছিল। তবলাও পেটাতেন অল্পস্বল্প। আহামরি বাজনা কিছু নয়। কিন্তু মানুষটি ছিলেন যথার্থ সজ্জন। তাঁর পাণ্ডিত্যও প্রচুর, কিন্তু তার প্রকাশ কোথাও পীড়াসৃষ্টি করে না। যোশীজীর কাছে বব্বন খাঁ কুড়ি টাকা ধার চাইলেন। সবাই অবাক। মুজরোই তো পেয়েছেন খাঁ সাব সাতশোর কাছাকাছি। হঠাৎ আবার ধার কেন? তাও মাত্র কুড়ি টাকা! যোশীজী তাড়াতাড়ি টাকাটা এগিয়ে দিতে, নিয়ে গম্ভীরমুখে পকেটে পুরলেন তিনি। বললেন, আল্লার দয়া তিনি আমাকে আপনার মত দিলসাফ্ মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। আপনার কাছে আমার একটু ঋণ থাক। তাতে মনে অহংকার জমতে পারবে না।

মৃত্যু আসন্ন জেনে বব্বন খাঁ-ই আবার সবার ধার শোধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাগজপত্রে কোনো কিছুই তাঁর লিখে রাখার অভ্যাস ছিল না। মাথাতেই যত রাজ্যের কূট তাল আর ছকের হিসেবের সঙ্গে সঙ্গেই সাংসারিক যাবতীয় খুচখাচ্ ধরে রাখতেন। চেলাদের নানাজনকে পাঠালেন বিভিন্ন জায়গায়, সব ওই ধার মেটানোর ব্যাপারে। চন্দ্রজিতের মনে হয়েছিল, পাগলামি। নইলে পাঁচ টাকা দশ টাকা ফেরৎ দেবার জন্য কেউ তিরিশ পঞ্চাশ খরচা করেনা। মনিঅর্ডারে পাঠালে চলত না? কিন্তু উস্তাদের সঙ্গে তর্ক করার সাহস হয়নি।

লাখনাউ থেকে চন্দ্রজিৎ কলকাতায় এল নির্মল মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। কাশীপুরে তাঁর আশ্রমে রইল দুদিন। গঙ্গার ধারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে আশ্রম। নিরামিষ খাবারদাবারের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ ছিল ছিল না চন্দ্রজিতের। কিন্তু ওই আশ্রমের রান্না সোনামুগ ডাল, ফুলকপির ডালনা, ছানার তরকারির স্বাদ আজও তার জিভে লেগে আছে। তাছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় মালপোয়া। অমৃত, অমৃত।

খুব খেয়েদেয়ে আর মহারাজের শিষ্যদের সঙ্গে তর্ক করে সময় ভালই কাটছিল। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে না। মহারাজ দর্শন দিচ্ছেন না। ওদিকে আবার ফিরে যেতে হবে অসুস্থ উস্তাদের কাছে। মনের মধ্যে অস্থিরতা জমছে। রাধামাধবের মন্দিরে গিয়ে একটানা বসে থেকেছে, যদি দর্শন পায়। কিন্তু কোথায় মহারাজ?

তৃতীয় দিন খুব ভোরে, শেষরাত্রিই বলা উচিত, চন্দ্রজিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে তাকে ডাকছেন মহারাজজী। ধড়মড় করে উঠে বসল চন্দ্রজিৎ। মহারাজের নির্দেশে মুখে চোখে জল দিয়ে নদীর ধারে এল। পাথরবাঁধানো বেন্‌চের ওপর মহারাজ খাড়া বসেছিলেন। কুয়াশা-মাখা আশ্রম ঘুম ভেঙ্গে সারাদিনের কাজের জন্য তৈরী হচ্ছিল। অনেক বছর বাদে চন্দ্রজিৎ যখন দূর বিদেশে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল আর আত্মহত্যার জন্য সাহস সঞ্চয় করছিল, সেই সময়, হঠাৎই মনে হয়ে গিয়েছিল সেই গঙ্গাপারের আশ্রম, নিঃস্তব্ধ ভোরবেলা, আর নির্মল মহারাজের প্রশান্ত মুখচ্ছবি। ধর্ম নিয়ে আজীবন ঠাট্টাতামাসা করে আসা চন্দ্রজিৎ সেদিন বেঁচে গিয়েছিল।

খুব মৃদুস্বরে মহারাজ জিজ্ঞেস করেছিলেন, খাঁ সাহেবের কী আদেশ?

ভয়ে সংকোচে তোতলামি এসে গিয়েছিল চন্দ্রজিতের। আজ্ঞে, উস্তাদজী আপনাকে দশটা টাকা দিতে বলেছেন। বলেছেন, আপনি বুঝবেন।

দুটি উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বিদ্ধ করল চন্দ্রজিৎকে। একটু বা তাতে বেদনার ছায়া পড়ল। অচঞ্চল গলায় মহারাজ বললেন, খাঁ সাহেবের দেহ কি পীড়া

দিচ্ছে?

তারপর দীর্ঘক্ষণ আর কথা কইলেন না। একবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, রাধেমাধব। জলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ডাকটা যেন অনন্তের দিকে চলে গেল।

চন্দ্রজিৎ বললে, তাহলে অনুমতি করুন, আমি আজ লাখনাউ ফিরে যাই।

মহারাজ বললেন, হ্যাঁ, যাও। চিন্তা কোরোনা, এখনও কয়েকমাস উনি থেকে যাবেন। ওঁকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। আর বোলো, উনিতো ঋণভার নাবিয়ে দিচ্ছেন। আমি ওঁর ঋণ কী ভাবে শোধ করি?

উঠে এল চন্দ্রজিৎ। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে স্থির বসেছিলেন মহারাজ। তাঁর পাশে রাখা নোটটা হাওয়ায় উড়ে পড়ল ভেজা ঘাসের উপর তাঁর পায়ের কাছে। পড়েই রইল।

অনেক বছর বাদে আমেরিকা থেকে ফিরে বিধ্বস্ত চন্দ্রজিৎ ছুটে গিয়েছিল অতীতের ওই ছবিটার কাছে। কিন্তু ছবিটা মুছে গিয়েছিল। অতীত বড় নির্মম। একবার, মাত্র একবার, ছোট ছোট সুখের স্বর্গ মহাকাল হাতের কাছে এনে তারপর চিরকালের মত সরিয়ে দেন। ফিরে যাওয়া যায় না, যায় না।

চেলারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে আশ্রমটা চৌপট করে দিয়েছিল। রাধামাধবের অষ্টধাতুমূর্তি গয়নাগাঁটি সমেত লোপাট হয়ে গেল এক রাত্রে। সন্দেহ বশে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল একজন আশ্রমবাসীকে। কিন্তু প্রমাণিত হল না কিছুই। অন্ধকার নানা সুরঙ্গপথে মূর্তিটা চলে গেছে ইয়োরোপ বা আমেরিকার কোনো ধনকুবেরের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। পাথরের মাধব আত্মরক্ষা করতে পারেননি। রাধা তো সঙ্গে যাবেনই। কে জানে, পুজোআর্চা, ভোগ, ঘণ্টাধ্বনি হয়তো তাঁদের ক্লান্ত করে দিয়েছিল। আরামেই আছেন এখন ভেলভেট মোড়া দেয়ালসিন্দুকের গোপন অন্ধকারে। চমৎকার কিউরিও হয়ে।

এর অনেক আগেই নির্মল মহারাজ চলে গিয়েছিলেন। ওই পাথরের বেনচটা যেখানে ছিল তার কাছাকাছিই পাকা সমাধি। একটা শিউলি আর একটা কুর্চি গাছ শুধু আশ্রমপিতাকে ত্যাগ করেনি। নিয়মিত ফুল ছড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর সমাধিস্থলে।

আশ্রমের বিরাট বাগানদুটো উধাও। ফুলবনে বসত করেছে জবরদখলকারী প্রায় একশ পরিবার। ঘেঁষাঘেঁষি করে ঝোপড়ি উঠেছে সার সার। তরকারি বাগানের দিকে পানবিড়ি সোডালেমনেড চায়ের সব দোকান বসে গেছে। একেবারে ঝাণ্ডা উড়িয়ে ইনকেলাব জিন্দাবাদ করতে করতে দিনদুপুরে। আশ্রমচালকরা থানায় গিয়েছিলেন। পুলিশ এসে একবার নিয়মরক্ষা করে গেল। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা এসে জোর মিটিং করল। খুব বক্তৃতা হল। এবং তারপর প্রতিক্রিয়ার একটা বিরাট দুর্গ যে চূর্ণ করা গেছে এই বিশ্বাস মনে জাগিয়ে

রেখে উৎসাহী তরুণরা সব চলে গেল হিন্দী সিনেমা দেখতে।

জবরদখলকরা জমিই ফের পানজাবিদের বিক্রী করে কেউ কেউ অন্য দিকে চলে গেলে গজিয়ে উঠল একটা আস্ত মোটর মেরামতের কারখানা। ওই বিচিত্র কোলাহলের মাঝখানে, অবলুপ্ত ধূপধুনা আর ফুলের সৌরভের জন্য হাহাকার বুকে নিয়ে, সমাধি আর শূন্য মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম রেখে চন্দ্রজিৎ ফিরে গেল দাঁড় করিয়ে রাখা ট্যাকসির কাছে।

করিডরে একটা গোলমাল শোনা গেল। সেটা বাড়তে বাড়তে ঘরের মাঝখানে চলে এল। চমকে মুখ তুললেন চন্দ্রজিৎ।

জনা দশ বার উত্তেজিত মানুষ। আর তাদের সঙ্গে ব্যাজধারী দুই ভলানটিয়ার। ঝাঁকড়াচুল ছেলেটি বলছিল, আপনারা এরকম করবেন না। জোর করে গ্রীনরুমে ঢুকে পড়া আপনাদের উচিত নয়। একটা ডিসিপ্লিন রাখবেন তো!

রগচটা, ধুতির উপর শার্ট পরা মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, রাখুন মশায়! আমরা সব জেনুইন টিকিট হোলডার। বিনি পয়সার খদ্দের নই। কুমারনাথ এসেছেন বলছেন। কই, কোথায় তিনি দেখান। যত সব ধাপ্পাবাজী।

দলের আরেকজন, চুল কাকের বাসা, চোখে গোগো চশমা, বললে, ইয়েস ইয়েস। হোয়ার ইজ হি? প্রডিউস হিম।

অন্য ভলানটিয়ারটি বিপন্ন গলায় বললে, কী মুশকিল। গ্রীনরুমে তিনি এখনও আসেননি। কিন্তু আসবেন। ওই দেখুন না, ওঁর সঙ্গে বাজাবেন বলে চন্দ্রজিৎজী এসে বসে আছেন।

সব কজনের দৃষ্টি ফিরে গেল চন্দ্রজিতের দিকে। পানের ওপর খয়ের গুড়ো ছড়াতে ছড়াতে মুখ তুলে তিনি হাসলেন। আজকের পাবলিক তাঁকে চেনে কি চেনে না কে জানে। তবু বললেন, কুমারনাথ কলকাতা এসেছেন। এসে পড়বেন দু দশ মিনিটে।

উত্তেজনা কমে এসেছিল। ঝোঁক বুঝে ঝাঁকড়া চুল বললে, চলুন, রমেনদার সঙ্গে কথা বলবেন চলুন।

আবার সব চুপচাপ। একা চন্দ্রজিৎ। ধক ধক শব্দ করে এয়ারকনডিশনার চলছে। মনে হচ্ছে জাহাজের ইনজিন। পান গালে পুরে জর্দার কৌটো তুলে নিলেন চন্দ্রজিৎ।

আবার লাখনাউ। ফিরে গিয়ে রিপোরট করলে চন্দ্রজিৎ সব উস্তাদের কাছে। হাসলেন বব্বন খাঁ। রোগক্লিষ্ট হাসি। বললেন, আল্লা মালিকের দয়ামাখা এ এক বিচিত্র দুনিয়া চন্দরজিৎ। গুণী মানুষ যাঁরা, তাঁরা কুর্ণিস করতে করতে কবরে যান। আর কুঁড় যারা, মূরখ যারা, তারা সেলাম নিতে নিতে

ফ‌ুস্ হয়ে যায়।

নীলকান্ত যোশী দেখা করতে এলেন শেষবারের মত। সঙ্গে কিশোরী যশোমতী। তাকে দেখে চন্দ্রজিৎ অবাক। ক-বছর আগের সেই গাব্দা গোব্দা নইনিতাল আলু কোন্ মন্ত্রে এই পেলব মায়াহরিণী হয়ে উঠল?

বব্বন খাঁ বললেন, যোশীজী, সারাজীবন অনেক সৎ মানুষের কাছে উধার করেছি। যাতে ঘমন্ড না জন্মায়। অহংকার শিল্পীর বড় দুষমন। সব ধার নামিয়েও দিলাম গোরে যাবার আগে। শুধু দুটি মানুষের কাছে ঋণ রেখে দিলাম। আমার বিবি। আমার জন্য সারা জনম, আহা, বেচারী কতই না সহ্য করেছে। তাঁর মুখের দিকে চাইতে আমি কেঁপে যাই। আর আপনি যোশীজী। বিশ টাকা কিছু না। কিন্তু থাক ওটা বাকি। ওটা দেব না। যত টাকাই দিই, আপনার দেওয়া বিশ টাকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। সে থাক্, আর একটা দয়া আপনাকে করতে হবে। আমার চার চারটে ছেলে। সবকটা বাখোয়াস। অপদার্থ বজ্জাত সব। একটাও ঘরের ইজ্জৎ রাখতে শেখেনি। আমার দুই জামাইকে কিছু তালিম, ঘরের কিছু চিজ্ দিতে পেরেছি। কিন্তু বেটা বলতে ওই আমার চন্দ্রজিৎ। ওকেই যত দিয়েছি, সব ঘুরে পেয়েছি। আমাদের ঘরের নিশান আমার সঙ্গেই মাটিতে যাবে। কিন্তু যতটুকু ঝলক থাকবে সব ওই চন্দরের হাতে। ওই দুটি হাতের ভার আপনি নিন।

নীলকান্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমার পক্ষে যা—

বাধা দিয়ে বব্বন খাঁ বললেন, আমি যশোমতীর কথা বলছি।

গুরুর মৃত্যুরও প্রায় দু সাল বাদে চন্দ্রজিতের ঘরণী হয়ে এল যশোমতী। এর মধ্যে একবার বিলেত ঘুরে এসেছে চন্দ্রজিৎ। বব্বন খাঁ নেই। কিঞ্চিৎ অসহায় বোধ করছে চন্দ্রজিৎ। গুরুভাইরা সব ছড়িয়ে গেছে। নতুন ছাত্ররা, বয়স্ক গুরুভাইও কেউ কেউ, তালিম নিচ্ছে চন্দ্রজিতের কাছে। মাঝে মাঝে ডাক পড়ছে গোয়ালিয়র তানসেন সমারোহ থেকে, মথুরায় হরিদাস স্বামী সংগীত থেকে, কোলকাতার তানসেন, সদারঙ্গ সুরদাস পারক সারকার্স থেকে, পাটনা বোম্বাই জলন্ধর দক্ষিণ ভারত থেকে।

হঠাৎ এল একদিন আনোয়ার, উস্তাদ নাজির খাঁর কাছ থেকে। বিলাতে যাচ্ছেন নাজির খাঁ। কিনিয়া লনডন লিভারপুল প্যারিস। সঙ্গে কি যাবে চন্দ্রজিৎ?

যাবে না কি মানে? লাফিয়ে চলে গেল চন্দ্রজিৎ। কি বিরাট চান্স একটা। চেনাজানা তবলিয়ারা ঈর্ষা করতে লাগল তাকে। যাবার আগে বোমবাই শহরে সংগীত সমালোচকদের ভোজ দিলেন নাজির খাঁ। ফেরার পর দিল্লিতে। অনেক বড় বড় কথা। বিদেশে সাহেব মেমরা কেমন ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীত শুনে শুনে বর্বর রুচিকে পরিশীলিত করে নিচ্ছে তার বিস্তারিত বর্ণনা

দিলেন, রঙ্গ রসিকতা করলেন। কাগজের ক্লিপিং দেখালেন। সব মিলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি একটা বিরাট কাজ করে এসেছেন।

ঘরের একপ্রান্তে চুপচাপ বসে ছিল চন্দ্রজিৎ। এক মহিলা সাংবাদিক শুধালেন, আপনি কিছু বলবেন না?

চন্দ্রজিৎ মুখ খুলবার আগেই নাজির খাঁ বলে উঠলেন: ভাল কথা। আমার উচিত ছিল এই বাচ্চার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া। এ হল চন্দ্রজিৎ, বব্বন খাঁ সাহেবের এক শাগীর্দ। এবার আমি একে নিয়ে গিয়েছিলাম। সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রতি বছর আমাকে বিলায়েৎ আমেরিকা করতে হয়। বড় বড় তবলিয়াকেই আমি নিয়ে যাই। এবার তবে একে নিলাম কেন? আসলে আমি জওয়ান ছেলেদের সুযোগ দিতে চাই। আমরা আর কদিন? ওরা সামনে আসুক। তবে একথা বলব, নতুন হলেও, সাহেবদের সামনে বাজানোর ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হলেও, চন্দর বেটা আমার মুখ রেখেছে। মোটামুটি ভালই বাজিয়েছে বলতে হবে। বেয়ারা, বেয়ারা, এঁদের সব ড্রিংকস্ দাও। কতক্ষণ বসে বসে এই বুড়োর শুখনো বক্তৃতা শুনবেন এঁরা।

চুপচাপ সব দেখে গেল শুনে গেল চন্দ্রজিৎ। তার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। শরীর সংস্থান অনুকূল হলে নিজেকে নিজে লাথি মারত চন্দ্রজিৎ। কী বোকা, কী বোকা সে! নাজির খাঁর মত লোকের সঙ্গে এঁটে ওঠা তার কম্ম নয়। কাকে বলবে সে, কী ব্যবহার সে পেয়েছে ওই মানুষটার কাছে। কেন অন্য তবলিয়াদের বাদ দিয়ে তাকে নিয়েছিলেন নাজির খাঁ। সাংবাদিকদের যে সব কাগজ দেখালেন তিনি, সেগুলো সব বাছাই করা। ভাল ভাল মন্তব্যই রাখা আছে। কড়া সমালোচনা সব বাদ। চন্দ্রজিতের সম্বন্ধে প্রশংসা যথেষ্টই বেরিয়েছে। একটাও সাংবাদিকদের দেখালেন না নাজির খাঁ। কিনিয়া এবং প্যারিসে নাজির খাঁর চেয়ে অনেক বেশী অভিনন্দন পেয়েছে চন্দ্রজিতের তবলা। রেগে কাঁই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এখন বদলা নিলেন। আনাড়ি চন্দ্রজিৎ সঙ্গে করে কোনো কাগজ নিয়ে আসেনি সভায়। ফের কি মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে আবেদন রাখতে যাবে, ওগো, তোমরা শোন। সাহেব মেমরা আমার বাজনা শুনেও গলে গেছে?

রামঃ। ও পথে চন্দ্রজিৎ যাবে না। তাছাড়া টাকা কোথায়? আড়াই মাস বিদেশ বাসের ফল, মাত্র পাঁচশটি টাকা। ওই টাকা ঠেকিয়েই নাজির খাঁ সেরে দিয়েছেন। 'টাকা টাকা, তোমাদের শুধু টাকার ধান্দা। বিলায়েৎ যেতে পারলে, আমার সঙ্গে ঘুরতে পারলে, সেটা বুঝি কিছু না? যাবার আগে কড়ার করে নাওনি কেন?'

পরের বছর আবার ডাক পড়ল। চন্দ্রজিৎ গিয়ে স্পষ্ট বলল: এবার তো

আমি নতুন নই, বিলায়েৎও নতুন নয়। কত টাকা দেবেন?

কটমট করে তাকিয়ে থেকে নাজির খাঁ বললেন, দুনিয়াটাই বেইমান হয়ে গেছে।

দু হপ্তা বাদেই কুমারনাথ ডেকে পাঠালেন তাকে। ঝংকার-এর প্রোগ্রাম করতে এসেছে কলকাতা। কুমার এসেছেন রেডিও সংগীত সম্মেলনে। গ্র্যান্ড হোটেলে কুমারের ঘরে যেতে তিনি বললেন, তুমিতো অমুকের সঙ্গে গেলে না বিলেত। আমার সঙ্গে আমেরিকা যাবে? চার পাঁচ মাস থাকতে হবে কিন্তু।

চন্দ্রজিৎ বললে, না।

অবাক হলেন না কুমারনাথ। মৃদু হেসে বললেন, বুঝেছি। নতুন বউকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে?

চন্দ্রজিৎ বললে, না, তা নয়।

একটু ভুরু কুঁচকে থেকে কুমারনাথ আবার হাসলেন। বললেন, বুঝেছি এবার। দেখ, সবাই কি নাজির খাঁ? চল আমার সঙ্গে, তোমার লোকসান হবে না।

সত্যি লোকসান হয়নি। আশার অতিরিক্ত অর্থ পেয়েছিল চন্দ্রজিৎ। বিস্তর সওদা করে এনেছিল আমেরিকা কানাডা লনডন থেকে। সেই লনডন, যেখানে হাতে পয়সা না থাকায় হোটেলের বাইরে একলা বেরুতে পারেনি আগের বার। লিভারপুলের দমবন্ধ পরিবেশে হাউ হাউ কেঁদেছিল নোংরা কামরায় একলা বসে।

খুব খুশী হয়েছিল যশো ছ-মাস বাদে স্বামীকে বুকে পেয়ে। অত জিনিষ পেয়ে। যদিচ দামী গাউনটা লজ্জায় পরতে পারেনি কখনও।

কিন্তু শুধু টাকা নয়। তার চেয়েও অনেক বড় লাভ তার জীবনে ঘটিয়ে দিয়েছেন কুমারনাথ কপিল। শিল্পী হবার তালিম দিয়ে গিয়েছিলেন বব্বন খাঁ। আর আধুনিক যুগের প্রফেশনাল হবার শিক্ষা দিয়েছেন কুমারনাথ কপিল।

'অ্যামেচারদের যুগ শেষ হয়ে গেছে চন্দ্রজিৎ। ভালই হয়েছে। অন্যান্য সব বৃত্তির মত গানবাজনার ব্যাপারটাতেও সেকেলে শৌখিন মানুষদের গা এলানো হাবভাব আর চলবে না। চলে না। এ যুগ ব্যস্ততার যুগ। মানুষজন হরদম ব্যস্ত থাকছে। তাদের সময়ের দাম তোমার চেয়ে কিছু কম নয়। বড়ে গোলাম আলি জিনিষটা বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাকিয়ে দেখ রবিশংকরজীর দিকে। তিনি শুধু বিদেশের পথ আমার তোমার মত মানুষের জন্য খুলে দিয়েছেন তা নয়। তিনি আমাদের যুগের উজ্জ্বলতম প্রফেশনাল। পশ্চিম দুনিয়ার যে কোনো প্রফেশনালের সঙ্গে একমাত্র তিনিই টক্কর দিতে পারেন।

'কখনো কোনো কারণেই কোনো এনগেজমেনট রাখার ব্যাপারে গাফলতি যেন না হয় চন্দ্রজিৎ। পাবলিক তোমার মুড দেখতে চায় না। তোমার কলাকারি

দেখতে চায়। তুমি ওদের সিরিয়াসলি না নিলে ওরাও নেবে না।'

আবার চন্দ্রজিৎ যখন মারকিনি জীবনের আকর্ষণে পড়ে থেকে যেতে চাইল ও দেশে, কুমারনাথ খুশী হতে পারেননি। বলেছিলেন, সন্দেহ নেই এখানে আরাম আছে, টাকা আছে, দুশো মজা আছে। যদি চাকরি করতে চাও, আমেরিকার মত জায়গা নেই। কিন্তু তুমি আমি আরটিসট মাই ডিয়ার। এদেশে যত রাজার হালেই থাকি, শিকড় গজাবে না। আমরা শুকিয়ে মরে যাব চন্দ্রজিৎ। সবাই রবিশংকর আলি আকবর নয় ভাই, ওঁদের কথাই আলাদা। তোমার আমার জন্য বানারস হরিদ্বারের গংগা চাই, হিমালয়ের বরফমাখা হাওয়া চাই, কন্যাকুমারীর সমুদ্দুর চাই। মাটি ফাটানো রোদ্দুর চাই! আমগাছ টবে হয় না চন্দ্রজিৎ।

না, টবের বনস্পতি হতে চায়নি চন্দ্রজিৎ। যশোমতীকে নিয়ে স্বচ্ছল নির্ঝঞ্ঝাট সংসার পাততে চেয়েছিল যুবক চন্দ্রজিৎ আরিজোনার ঊষর মাটিতে! অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী হয়েছিল তার, যারা ড্রাম না বলে তবলা বলতে শিখেছিল, বাজাতে শিখেছিল। একেক জনের নৈপুণ্য আর অধ্যবসায় অবাক করে দিয়েছে গুরুকে। যদিও একথা বার বার মনে হয়েছে, ওরা ভারতীয় সংগীত বুঝতে চাইছে যুক্তি আর গণিতের বজ্রবন্ধনীর মধ্যে। ছক নিয়ে যত মাথা ঘামায়, প্রাণের মর্মর নিয়ে ততটা নয়। বাজাতে বসে কোনো কাজ নিখুঁত আদায় হলে ওরা কেঁপে ওঠে না, উদ্বেলিত হয় না। ছ-ঘণ্টা রেয়াজ করে উঠে ঠাণ্ডা গলায় বলে, উড ইউ লাইক এ ড্রিংক, অর এ বিট অব সেক্‌স?

তবু, ব্যাংক অ্যাকাউনট ভারী হয়ে উঠছিল। এক বছরে দু-দুবার গাড়ি বদলালো চন্দ্রজিৎ। আমেরিকানদের স্বপ্নস্বর্গ প্যারিস ঘুরে এল। মেক্‌সিকো আরজেনটিনা ব্রাজিল পেরু প্রোগ্রাম করে এল। যশোমতীকে বেড়াতে নিয়ে গেল কানাডা।

কিন্তু প্রথম ধাক্কাটা এল ওই যশোমতীর কাছ থেকে।

মনে আছে চন্দ্রজিতের দেশের একটা ঘটনা। তখনও আমেরিকায় গেড়ে বসেনি চন্দ্রজিৎ। বছরে কয়েক মাস গিয়ে বিলেত আমেরিকা থেকে আসে, কোনো না কোনো শিল্পীর সংগে। সরকারী ডেলিগেশনে রাশিয়া পূর্ব ইয়োরোপ, মায় পূর্ব আফরিকা ঘুরে টুরে এসেছে। দেশে প্রোগ্রাম নেয়। কিন্তু তাগিদ নেই কোনো। ঠোঁট উলটে বলে বন্ধুদের কাছে—দেবেতো পার আইটেম দেড়শটি টাকা। দুশো আড়াইশো চাইলে কম্মকত্তারা তো অজ্ঞান হয়ে যাবে সব। ওসব ফালতু ঝামেলায় যাবার দরকার কী?

কলকাতার একটা জলসায় নিমন্ত্রণ স্বীকার করেও চন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত এল না। উলটে, চলে গেল কাশ্মীর। লাখনাউ ফিরে দেখে ইয়া সাম্‌পাট এক উকিলের চিঠি। রমেনের সংগে সেই প্রথম পরিচয় চন্দ্রজিতের।

হাজার হলেও আইন আদালতের ব্যাপার। ভিতরে ভিতরে দমে গেল চন্দ্রজিৎ। ভাবছিল কার কাছে যায় পরামর্শের জন্য। এমন সময় এলাহাবাদ এলেন কুমারনাথ বাজাতে। চলে গেল চন্দ্রজিৎ এলাহাবাদ।

মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিলেন ঝামেলাটা কুমারনাথ। কিন্তু বেশ কড়া কথাও কিছু শুনিয়ে দিলেন। কিঞ্চিৎ খারাপ মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরল চন্দ্র।

এসে দেখে শ্বশুর এসেছেন। বাড়িতে হইচই। কিন্তু আনন্দের কিছু নয়। যশোমতীর শরীর খারাপ হয়েছে। কী হয়েছে, কেউ ঠিক জানে না। কাউকে বলবেও না। ডাক্তার এসেছিলেন। তার একটি প্রশ্নেরও জবাব পাননি রোগিণীর কাছে। ফলে আন্দাজে কয়েকটা টনিক জাতীয় ওষুধ লিখে দিয়ে ফি পকেটস্থ করে বিদায় নিয়েছেন। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে যশো। দাঁতে একটি কণাও কাটছে না। চার পাঁচদিন ধরে এই চলছে।

গম্ভীর শ্বশুরের সামনে কেমন যেন অপরাধী মুখ করে দাঁড়াল এসে চন্দ্রজিৎ। বুঝলেন নীলকান্ত যোশী জামাইয়ের অবস্থা। কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, ঘাবড়িও না। তোমার কোনো ত্রুটি নেই। আগেও এরকম হয়েছে ওর। দু-এক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

হলও তাই। পরদিন চন্দ্রজিৎ স্ত্রীর ঘরে গিয়ে দেখে বিছানা খালি। ধূপের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পুজোর ঘরের দিকে এগোতে যাবে, হাতে প্রদীপ নিয়ে যশোমতী এসে হাজির। কোন্ সকালে উঠে স্নান সেরে কোটা প্রিনট-এর শাড়ি পরে নিয়েছে। শিখার উপর হাত রেখে ওই হাত বুলিয়ে দিল স্বামীর বুকে, কপালে। তারপর প্রণাম করলে তাকে। দুর্বল শরীর টলে যাচ্ছিল। দুহাতে ধরে ফেলল চন্দ্রজিৎ।

অনেকদিন বাদে আবার ওই কাণ্ডটা একদিন করল যশোমতী। ছেলে ইন্দ্রজিতের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে। টেলিভিশনে একটা হিচ্‌ককী ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক গলায় কথা বলছিল চন্দ্র। টিভি যশোমতীর খুব একটা প্রিয় নয়। ক্যানডিড ক্যামেরা, রাস কনওয়ের পিয়ানো, হ্যারি বেলাফনটে বা শারলি বেসি জাতীয় গাইয়েদের গান, ডোনালড ওকুনার এবং সারজেনট বিল্‌কো-র ভাঁড়ামি 'আই লাভ লুসি'—এই রকম কয়েকটা প্রোগ্রাম ছাড়া যশো কিছু দেখতে চায় না। কাউবয় মারকা গুড়ুম গুড়ুম গুলি চালানো ছবি দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে যশোমতী।

চন্দ্রজিৎ বলেছিল ছেলেকে দেশে পাঠিয়ে দেব। তার দাদুর কাছে থেকে পড়াশোনা করে ডাক্তার বা এনজিনিয়ার হবে। আর যদি সংগীতের দিকে ঝোঁক জন্মায় তবে গাবাইয়া বা যন্ত্রী হবে। তবলা? পাগল। তবলিয়া হতে যাবে কোন দুঃখে? রেওয়াজ করে করে জান কয়লা হয়ে যাবে। অথচ মুখনাড়া শুনতে হবে প্রধান শিল্পীর। যেন তাঁরাই সব। আরে, তাহলে নিতে হয় কেন তবলাকে?

একলাই সবটা বাজা না দেখি। পাবলিক নেবে? না, নিজে তবলিয়া হয়ে ঠকেছি। ছেলেকে ওর মধ্যে পাঠাবে না।

যশোমতী হঠাৎ খট করে টিভি বন্ধ করে দিল। বললে, ছেলে তবলা বাজাক না বাজাক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওকে দেশে পাঠাবে কেন? তুমিতো হরদম ট্যুর করে বেড়াচ্ছ। একলা সময় আমার কী করে কাটে, তুমি জান? একটা লোক নেই যে দুটো মনের কথা বলি। এই রূপী বাঁদরগুলোর সঙ্গে হাঁউমাঁউ করা, উঠতে বসে থ্যাংকু থ্যাংকু বলা, ওসবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আর তোমাদের সব হয়েছে একধারা। সঙ্গে একগাদা সাহেব মেম নিয়ে না ঘুরলে চলে না। ছোঁড়াছুঁড়িগুলো গাঁজাফাঁজা খেয়ে সবসময় ব্যোম হয়ে থাকে। ওই যে বিল্ ছেলেটা। এমনিতে তো ভালই। তবে তুমি গেলে, ওই যে ওই শহরটা, গরুমোষের নামে নামে—

চন্দ্রজিৎ বললে, বাফেলো।

যশোমতী বললে, হ্যাঁ ওই যে কী যেন নাম। যাই হোক্, বিল রাত্রে এসে হাজির। একগাদা লাল হলুদ বড়ি বের করে টেবিলে রেখে আমাকে জোর করে খাওয়াবেই। আর সব নানা খারাপ কথা। আমি পালিয়ে গেলাম রান্নাঘর। সেখানেও এসে হাজির।

দমবন্ধ করে ছিল চন্দ্রজিৎ। বললে, তারপর?

ঠোঁট উলটে যশোমতী বললে, তারপর আর কী? এক কাপ দুধ খাইয়ে ওকে ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু ওকথা থাক। তুমি ইন্দ্রকে যদি পাঠিয়ে দাও, তবে আমিও না হয় চলে যাই। আর পারছি না।

চন্দ্রজিৎ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। খালি হয়ে আসা গেলাসটা আবার ভর্তি করে নিলে। একটানে জানলার পরদা সরিয়ে দিতেই কাঁচের গায়ে বিন্দু বিন্দু আলো ফুটে উঠল শহরতলীর।

বললে, আমি জানতাম না যশো তুমি এত অসুখী। ছোটবেলা থেকে আমি স্বপ্ন দেখেছি সাজানো গোছানো ছিমছাম একটা বাড়ির। স্বপ্ন দেখেছি স্বচ্ছল দিনের। পছন্দমত জিনিষ কিনতে গিয়ে যখন মানিব্যাগ টিপেটুপে দেখতে হবে না টাকা আছে কি নেই। আমাদের এটা বাড়ি নয় ঠিকই, কিন্তু তাকিয়ে দেখ, যা দরকার আর চেয়ে ঢের বেশীই এই ফ্ল্যাটে আছে। এরকম সাজানো কিচেন তুমি দেশে পাবে? এই রকম একটা সংসার আমি গড়ে দিতে পারব তোমাকে? দেশের জন্য কি আমার কষ্ট হয় না? কিন্তু কী পেতাম আমি দেশে থাকলে? আমার স্বপ্নই থাকত। এই যে, যে হুইসকিটা খাচ্ছি, সেটা কেনার টাকাও থাকত? তুমি দেখনি, দেশের কত খেতাব পাওয়া শিল্পী, কত লেখাপড়া জানা পণ্ডিত আমার অ্যাপারটমেনট-এ এসে কেমন আদেখলা পনা করেন এটা ওটার জন্য? সেই মন্ত্রীর কথা মনে নেই যিনি চেয়ে চিন্তে

তোমার কুইকমিক্‌স যন্ত্রটা নিয়ে গেলেন? বললেন, লস্‌সি তৈরী করে খাব? ঠিক আছে, সংসার তো একলা আমার নয়। তুমি যদি শান্তি না পাও, কী দরকার তবে এসবে? চল সবাই দেশে চলে যাই। তবে কনট্রাকট না ফুরোতে তো যেতে পারব না। এই এক দেড় বছর তাহলে এসো কিছু টাকা জমাই। যাতে দেশে ফিরেই 'প্রোগ্রাম দাও গো' বলে কনফারেনস-কর্তাদের দরজায় দরজায় ঘুরতে না হয়।'

এক বছরের মাথায় দেশে ফিরে গেল যশোমতী ছেলে নিয়ে। হঠাৎ মার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। মাস চারেক বাদে নীলকান্তর জরুরী তার পেয়ে এল চন্দ্রজিৎ। ছেলেকে ভর্তি করে দিল দুন্‌ স্কুলে। আর শ্বশুর জামাই দুজনে মিলে যশোমতীকে রেখে এল রাঁচি। অন্য কোনো উপায় ছিল না। ডাক্তার বললেন, অনেকদিনের ডিপ্রেশান জমে জমে মন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে। বাইরে থেকে হয়তো বোঝা যায়নি। দেখলে এখনও অনেকেই বুঝবেনা। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। জিনিষপত্র ভাঙচুর করা—তাও কখনও করেনি যশোমতী। শুধু চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাষাহীন। বুদ্ধি বোবা হয়ে গেছে। অধিকাংশ সময় কাউকে চিনতে পারে না। সাইকেলের ধাক্কায় দারুণ আহত হল ইন্দ্রজিৎ। রক্তারক্তি কান্ড। বাড়ি তোলপাড়। যশোমতী নির্বিকার বসে রইল। খাবার দিলে খায়। না দিলে ভ্রূক্ষেপও নেই। একরাত্রে উঠে কখন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে। সকালবেলা খোঁজা খুঁজি, ব্যস্ততা। এগারটা নাগাদ দেখা গেল গোমতীর জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে যশোমতী। চন্দ্রজিৎ গিয়ে বলল, বাড়ি চল। হাত ধরে আকর্ষণ করতেই উঠে এল যশোমতী।

কাঁকে রোডে বাঁক নেবার মুখে বিরাট একটা ট্রাক এসে ওদের ট্যাকসিকে তুবড়ে দিয়ে গেল। মাথায় আঘাত পেলেন নীলকান্ত। হাঁটু জখম হল চন্দ্রজিতের। গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে গেল যশোমতী। বরাত ভাল, তার কিচ্ছু চোট লাগেনি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চন্দ্রজিৎ স্ত্রীর কাছে গেল। ধুলো বালি পাথর কাঁকড়ের মধ্যে যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুল. থুম্‌বু মেরে বসে ছিল যশোমতী। সংসার, পৃথিবী, আমরা সবাই. একটা মানুষকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি মাটিতে—চন্দ্রজিৎ ভাবল—আর দেখ, কেমন নির্বিবাদে সে সেটা মেনেও নিয়েছে। সত্যিকার শান্তি কে পেয়েছে? ও—একটা পাগল-ছাগল মানুষ—না, আমি? ওরই অহংকারী, কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষম স্বামী? চোখে জল এসে গেল চন্দ্রজিতের।

হাসপাতালে নারস-এর সঙ্গে ভিতরে চলে যাবার ঠিক আগে যশোমতী হঠাৎ জোরে চন্দ্রজিতের হাত চেপে ধরল। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইল চন্দ্রজিৎ। এক মুহূর্ত যেন যশোমতীর মরে যাওয়া চোখ বেঁচে উঠতে চেষ্টা করল। তারপর আবার বরফ হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠা আশা ছাই হয়ে ঝরে পড়ল চন্দ্রজিতের মনের উপবনে।

এর পরও দু-বছর আমেরিকায় রইল চন্দ্রজিৎ। অনেক প্রোগ্রাম, অনেক টাকা, অনেক নাম, সবই হল। কিন্তু কোনো কিছুই যে আর আগের মত রইল না! মেয়েদের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ চন্দ্রজিৎ কখনও বোধ করেনি। যশোমতীই তার জীবনের একমাত্র রমণী। দেশে বিদেশে বহুজনকে শিহরিত করেছে সুপুরুষ চন্দ্রজিৎ। কিন্তু তাদের কারু সঙ্গে বিছানা পর্যন্ত হেঁটে যেতে আগ্রহ জাগেনি মনে। রমণীহীন জীবন আরও অরমণীয় হয়ে উঠল, যখন নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য চন্দ্রজিৎ রোজ লাগামছেঁড়া মাতলামিতে মজল। একলা ঘরে, নির্জন রাতে, নিঃসঙ্গ দুপুরে মাতাল চন্দ্রজিৎ হাহাকার করে বলেছে: বড় কষ্ট। মরুভূমির দৈত্যাকৃতি প্রবীণ ক্যাকটাসের কাছে গাড়ি থামিয়ে চুপিচুপি বলেছে: বড় কষ্ট। আগ্রহী অনাবৃত নারীদেহ সবলে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলেছে: বড় কষ্ট। কেউ বোঝেনি। পরদিন সকালবেলা ঠিক ঠিক সূর্য উঠে পড়ে আবার আলো দিতে লেগে গেছে।

দরজা ঠেলে ব্যস্ত দুই ভলানটিয়ার ঢুকে পড়ে চমকে দিল চন্দ্রজিৎকে। একজন বললে, কুমারনাথ এসেছেন শুনলাম। এইদিকে এসেছিলেন?

মাথা নাড়লেন চন্দ্রজিৎ। ভয়ে তাঁর মেরুদণ্ড আবার জমে গেল। এসে পড়েছেন কুমার? তাহলে তো আর টাইম নেই। এইবেলা পালিয়ে যাওয়া উচিত। নইলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। বাঁ হাতটা তুলে ধরলেন আলোর সামনে। বাজু থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত আস্তে আস্তে ডান হাতের আঙুল বুলিয়ে নিলেন। দেখে কিছু বোঝা যায় না। মনে হয় ঠিকই আছে। কিন্তু বিশ্বাস কী? ভিতরে ভিতরে নাড়িতে রক্তে অস্থি মজ্জায় কোন ষড় চলেছে কে জানে! সর্বাঙ্গ ঘেমে গেল চন্দ্রজিতের।

সেই দুঃস্বপ্নের রাত। নেশায় জড়ানো ঘুম ঘুচে গেল অসহ্য যন্ত্রণায়। ঘাড়, বাঁ হাত, কাঁধ সর্বত্র কেউ যেন হাড়ের মধ্যে ড্যাগার দিয়ে কুপিয়ে চলেছে। ব্যথা, ব্যথা, ব্যথা। টলমল পায়ে বাথরুমে গেল চন্দ্রজিৎ। পাগলের মত জলের ঝাপটা দিতে লাগল মুখে চোখে কানে। ট্যাবলেট খেল ব্র্যানডির সঙ্গে। সব বমি হয়ে বেরিয়ে গেল।

একঘণ্টা—অনন্তকাল—যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করে আর পারল না চন্দ্রজিৎ। অনেক কষ্টে অনেক সময় ধরে ডায়াল করল ইলিনাকে। ছাত্রী ইলিনা। শুধু ছাত্রী থাকতে না চেয়ে, আরও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় অসফল হয়ে, দূরে সরে যাওয়া ইলিনা।

চন্দ্রজিৎ জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, আমি যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি ইলিনা। তুমি শিগ্গীর এসো।

ইলিনা খুব ঠাণ্ডা গলায় বললে, গো টু হেল। অ্যানড গো প্রোনটো।

ইলিনা এল না। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে অ্যামবুলেনস চলে এল।

ইলিনাই ফোন করে দিয়েছিল।

হাসপাতাল থেকে বেশ কিছু মেদ আর মনোবল ঝরিয়ে বাড়ি ফিরে এল চন্দ্রজিৎ। ওষুধপত্র সবই ডাক্তাররা করেছেন। কিন্তু একথাও বলেছেন: উই আর ব্যাফল্ড। আমরা বিভ্রান্ত। কোনো পরীক্ষাতেই শরীরের কোথাও কোনো গোলযোগ ধরা পড়েনি। সে ব্যথার কথা তুমি বলছ, তার কোনো কারণ আমরা তো দেখছি না।

বিমূঢ় চন্দ্রজিৎ বলেছে: তবে অসুখ হল কেন?

দামী দামী ডাক্তাররা সব মাথা নেড়ে বললেন: অসুখ তোমার মনে। বায়ু পরিবর্তনে যাও। মন প্রফুল্ল রাখ।

বায়ু পরিবর্তনে যাওয়া সহজ, যদিও মরুভূমির এই টাটকা তাজা হাওয়া আর কোথায় মিলবে! মন প্রফুল্ল? হায়, পৃথিবীতে এর চেয়ে কঠিন কাজ কী আছে?

নিজে থেকেই জীবনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল চন্দ্রজিৎ। মদ খাওয়া কমিয়ে দিল। এক ছাত্রের সহযোগিতায় তবলা এবং ওই জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের উপর ইংরাজিতে একটা বই লিখতে শুরু করল।

নিউ ইয়রক রেডিও সেনটারে কুমারনাথের সঙ্গে বাজাতে গিয়ে আবার বিপদে পড়ল চন্দ্রজিৎ। কিছুক্ষণ দিব্য চলছিল সব। তার হাতের নিপুণ কারিগরি মুগ্ধ কুমারনাথের মুখ থেকে সাধুবাদও পেল। খুব জমজমাট পরিবেশ। শ্রোতারা তন্ময়। হঠাৎই সুর কাটতে লাগল। ভুরু কুঁচকে কুমারনাথ তাকালেন চন্দ্রজিতের দিকে। তার সমস্ত কপাল ঘামে ভিজে গেছে। বুক পিঠ বেয়ে লবণাক্ত স্রোত বইছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে চন্দ্রজিৎ। কিন্তু তার বাঁ হাত ক্রমেই অসাড় হয়ে আসছে। কোনো নির্দেশ মানতে পারছে না।

তার বিপদ বুঝে রাগ করলেন না কুমারনাথ। যতটা পারলেন সামলে সামলে চললেন। দ্বিতীয়ার্ধে শুধু আলাপ করে সময় পার করে দিলেন। হোটেলে ফিরে টকাটক কটা ঘুমের বড়ি খেয়ে চন্দ্রজিৎ শুয়ে পড়ল।

বাকি টুরটুকু আর কোনো ঝঞ্ঝাট হল না। কিন্তু দুজনে মিলে একদা যে সুর-তাল-লয়ে সমৃদ্ধ জমজমাট কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন, সেটাও ঠিক হল না। প্রত্যেকটি বাজনার আগে চন্দ্রজিতের ভিতরটা কুঁকড়ে যেত ভয়ে। একগাদা পেপ্ ট্যাবলেট মুখে পুরে ভয় তাড়াতে হত। সর্বদা চিন্তা, এই বুঝি আবার বাঁ হাতটা বিদ্রোহ করে। কুমারনাথও সতর্ক থাকলেন এত, তাঁর সরোদ প্রবীণ অভ্যাসে বেজে গেল, কিন্তু আকাশে কোনো নতুন তারা ফোটাতে পারল না।

কুমারনাথ দেশে ফিরে যাবার আগের রাতে চন্দ্রজিৎ বললে, আমাকে মাফ করে দেওয়া আপনার পক্ষে শক্ত হবে জানি। কিন্তু আপনি ছাড়া ক্ষমা চাইব কার কাছে?

বহুক্ষণ চুপ করে থেকে কুমারনাথ বললেন, 'চন্দর, আমি তো তোমার সবই জানি। তুমি আমার ছোটভায়ের মত। মাফ করার কথাই ওঠে না। কিন্তু এদেশ, এই জীবন, তোমার জন্যে নয়। তুমি দেশে ফিরে এসো।' চুপ করে রইল চন্দ্রজিৎ।

দেশে ফিরে এল এক বছর বাদে। বেশ হই চই হল। খবরের কাগজের ক্রিটিকরা এলেন সব অভিজ্ঞতার বিবরণ নিতে। ছবি বেরুলো কোথাও কোথাও। বিভিন্ন সংগীত সম্মেলন থেকে আমন্ত্রণ এল। ছাত্রদের ভিড় জমে গেল বাড়িতে। 'আমরা শুয়ে পড়ি, বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাও'—গোছের মুখচ্ছবি নিয়ে সারি সারি মেয়েরা এল অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে। হাফ এ ডজন হিপি হিপিনী ভারতময় ঘুরতে লাগল তার পিছনে পিছনে।

তারপর আবার চন্দ্রজিৎ একা। পর পর কয়েকটা প্রোগ্রাম ফ্লপ করার পর হঠাৎ বাজার গুটিয়ে গেল। বিরূপ মন্তব্য ছাপা হল কাগজে। ছাত্রছাত্রীরা সরে যেতে লাগল। বাদবাকিদের চন্দ্রজিৎ নিজেই সরিয়ে দিল। রাগে দুঃখে চোখে জল এসে যায় তার। ইচ্ছে হয় খ্যাচ করে অপরাধী হাতটাকে কেটে বাদ দিয়ে দেয় তার জীবন থেকে। তার জীবন! কী আছে আর আশা করবার?

আমেদাবাদ গিয়ে শ্বশুরের ব্যবসায় ঢুকে গেল চন্দ্রজিৎ। কোলের উপর বাঁ হাত স্থির হয়ে থাকে। ডান হাত পয়সা নাড়াচাড়া করে।

সময় বয়ে চলে। এক বছর, দুই বছর। চন্দ্রজিতের মনে হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী।

মাঝে মাঝে রাঁচি যায় যশোমতীকে দেখতে। তাকে দেখলে এখন আর বুক ভেঙে যায় না চন্দ্রজিতের। মনে হয় কত শান্তিতে আছে যশোমতী। পৃথিবীর কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। সেইজন্যই যেন এক বিন্দু বয়েস বাড়েনি যশোমতীর। রূপ উপচে পড়ছে। তবে ওই, এখনও যেন পাথরের মূর্তি। শুধু ছেলে ইন্দ্রজিতের মাথায় হাত রাখে। আর প্রণাম করে স্বামীকে। তারপর চুপচাপ বসে থাকে। এক সময় চন্দ্রজিৎ বলে, তাহলে আসি। ঘাড় নাড়ে যশোমতী। হ্যাঁ। ইন্দ্রজিৎ বলে, মা, চল আমাদের সঙ্গে। যাবে মা? যশোমতী মাথা দোলায়। না।

সেবার ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে যায় নি মাকে দেখতে। সামনে পরীক্ষা। মাঝরাত্রে ঘুমুতে না পেরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল চন্দ্রজিৎ। হোটেলের অন্য প্রান্ত থেকে সরোদের চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে। এ আওয়াজ ভুল করবার নয়।

দরজা খুলে দিয়ে প্রথমটা থমকে গেলেন কুমারনাথ। কাকে চান? তারপর হঠাৎই চিনতে পেরে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রজিৎকে। আরে চন্দরভাই! এসো এসো, ঘরে এসো।

বিছানায় লাবণ্যময়ী এক মহিলা গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে আধশোয়া ছিলেন।

আগন্তুক দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন।

হাতজোড় করে চন্দ্রজিৎ বললে: মাফ করবেন ভাবীজী। আমি জানতাম না আপনি আছেন।

কুমারনাথ আর ভদ্রমহিলা দৃষ্টি বিনিময় করলেন। চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। হো হো করে হেসে উঠলেন কুমারনাথ। তারপর বললেন, আমরা কি একটু কফি পেতে পারি, ম্যাডাম?

সংলগ্ন ঘরে উঠে গেলেন মহিলা চন্দ্রজিতের আপত্তি অগ্রাহ্য করে। কুমারনাথ বললেন, ওর নাম প্রিয়া। প্রিয়া রঙ্গনাথন। মোটেই তোমার ভাবী নন। কিন্তু ওসব কথা থাক। তুমি কেমন আছ? বাজাতে পারছ. না পারছনা?

চন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, আপনাকে সত্যি কথাই বলি। মাস কয়েক হল আমি রেগুলার রেওয়াজ করে যাচ্ছি। হাত নিয়ে কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না।

কুমার বললেন, তবে তুমি কোথাও বাজাচ্ছ না কেন?

'বাজাচ্ছি না, কারণ কেউ তো ডাকছে না। দুমাস আগে হরিদাস সংগীত সভা থেকে হঠাৎই চিঠি পেয়ে খুব উৎসাহ হল। খুব রেওয়াজ করতে লাগলাম। তারপর ও'রা খবর পাঠালেন, অনিবার্য কারণবশতঃ ও'দের পক্ষে আমাকে নেওয়া সম্ভব নয়। দুঃখিত।'

কুমারনাথ চুপ করে রইলেন।

চন্দ্রজিৎ বলল, লাখনাউ এসেছিলেন করিমুদ্দিন। তাঁকে সব বললাম। তিনি বলেছেন সাহায্য করবেন। অবশ্য একটু ঠাট্টাও করেছেন। 'তোমরা তবলিয়ারাতো গাইয়েদের গ্রাহ্যই করনা। যন্ত্রী ছাড়া কাউকে চেনই না। আমার সংগে বাজালে তোমার প্রেসটিজের হানি হবে না তো?' বলে গেছেন আমেদাবাদ আসবেন। দেখা যাক।

কফি হাতে ঢুকলেন প্রিয়া রঙ্গনাথন। এবার তাঁর গলার মঙ্গলসূত্র পরিষ্কার দেখতে পেল চন্দ্রজিৎ। চোখ সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, কী সুন্দর ফ্লেভার আপনার কফিতে।

কুমারনাথ বললেন, শুধু গন্ধে নয় চন্দর ভাই, স্বাদেও অতুলনীয়। আমি তো প্রিয়াকে বলি. দুজনে দুজনের সংসার ফেলে রেখে চল চলে যাই প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে কোনো দ্বীপে। শুধু তোমার হাতের কফি খেয়ে যে কটা দিন বাঁচি, বেঁচে থাকব। আর সরোদ বাজাব। তারপর সমুদ্রের কাছে গিয়ে মরে যাব আস্তে আস্তে।

প্রিয়া ভারী গলায় বললেন, তুমিতো জান কুমার, আমি মৃত্যুচিন্তা ভালবাসিনা।

দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে চন্দ্রজিৎ মনে মনে ভাবল, তোমরা ভাবতেও

পার না মৃত্যুর একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ানো কী। গুলিভরা পিস্তল বুকের ওপর রেখে একটা গোটা রাত পার করে দেওয়া কেমন অভিজ্ঞতা। যদি পরপার থেকে ফিরে আসা যেত, আমরা সবাই, খুব সহজেই, অন্তত একবার মরে দেখতাম কেমন লাগে।

চলে যাবার আগে কুমারনাথ বললেন, আজ থেকে ঠিক ছ-মাস বাদে তুমি যোগাযোগ করবে আমার সঙ্গে। যদি তখনও বাজাতে চাও, আমি তোমাকে নিয়ে বাজাব।

একটু দুঃখ পেল চন্দ্রজিৎ। ছ-মাস পরে কেন? তাঁর ওপর কি আস্থা রাখতে পারছেন না কুমারনাথ? তারপরই ভাবল, না না, উনি ঠিকই করেছেন। ছ-মাস টাইম উনি আসলে আমাকেই দিলেন প্রস্তুত হতে।

এর কিছুদিন বাদেই ব্যবসা উপলক্ষে বোমবাই গেছে। কাগজে দেখল মাতুশ্রী বিড়লা হলে প্রোগ্রাম হচ্ছে। কুমার করিমুদ্দিন দুজনেই আছেন। টিকিট কেটে চুপ করে হলে গিয়ে বসল। খুব লোভ হল গ্রীনরুমে যায়। লোভ দমন করল। ছ-মাস সময় দিয়েছেন কুমারনাথ। এখন কাছে যাওয়া যায় না। গান শুনল, বাজনা শুনল। সর্বক্ষণ হাতলে ঠেকা রেখে গেল। অত বড় বড় দুজন শিল্পী। অথচ হল আদ্দেক ফাঁকা। কলকাতা হলে উপচে পড়ত শ্রোতারা।

আমেদাবাদ প্রোগ্রাম করতে এসে কুমার বললেন, টগরের ইয়াদগার হচ্ছে কলকাতায়। আমাকে ওরা নিশ্চয় বলবে। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে বাজাবে ওই সম্মেলনে।

হঠাৎই ভয় পেল চন্দ্রজিৎ। না, কলকাতায় নয়। অত বড় সম্মেলনে নয়। এতদিন বাজাইনি। বরং আমাকে নিয়ে আপনি অন্য কোনো প্রোগ্রামে, অন্য কোথাও—

কুমারনাথ বললেন, চন্দর, তুমি না উস্তাদ বব্বন খাঁর পহেলা নমবরী শাগীর্দ। কাকে ভয়? কীসের ভয়? না, অন্য কোথাও তোমাকে নিয়ে আমি বসব না। হয় ওই জলসায়, নয়তো ব্যস্, আর কোথাও না। কখনো না!

ঝম ঝম করে চলছে কলামন্দিরের এয়ারকনডিশনার। যেন জাহাজ চলছে। নিয়ন বাতিগুলো ছায়াহীন আলো দিয়ে চলেছে কিম্ভূতুড়ে। সাজঘরের আয়নায় নিজের স্বেদাক্ত ভীত মুখ দেখতে পেলেন চন্দ্রজিৎ। আর সময় নেই। কুমারনাথ এসে পড়লে আর পালানো যাবে না। ওপাশের সিঁড়ি বেয়ে এই কুয়ো থেকে উঠে যেতে হবে উপরে। বসতে হবে স্টেজে। তারপর পর্দা উঠে গেলে? সর্বনাশ। এক হাজার দর্শক। দু হাজার হাত। চটাপট হাততালি পড়তে পারে, যার অর্থ হল: শাবাশ। আবার হাততালি পড়তে পারে অন্য ছন্দে: এ বেটা কেন? যা যা উঠে যা। ভেগে যা। এক হাজার কণ্ঠ বাহবা দিতে পারে। আবার যদি টিটকিরি দিতে শুরু করে—কী নির্মমই না হতে

পারে। এক হাজার মরমী শ্রোতা মুহূর্তে ক্ষুধার্ত দানব বনে যাবে। রক্ত চাইবে।

ব্যাগ হাতে উঠে পড়লেন চন্দ্রজিৎ। এই বেলা পালাই। পাগল পাথর যশোমতীর আমি ঘুণধরা স্বামী। কালজয়ী উস্তাদের অপদার্থ চেলা। কাজ নেই আমার আর শিল্পী হয়ে। পালাই।

দরজায় হাত রাখতেই বাইরের ধাক্কায় দরজা খুলে গেল। ব্যাগ হাতে পিছিয়ে এলেন চন্দ্রজিৎ।

কুমারনাথ। জামাটামা ছেঁড়া। কপালে কালশিটে। মুখে মদের গন্ধ। টলছেন মানুষটা।

'আরে চন্দরভাই, তুমি এসে গেছ? শাবাস। দুজনে মিলে আমরা আজ এখানে লাখো চিরাগ জ্বালিয়ে দেব। গ্রেট টগরের নামে। আমরা আরটিস্ট। আমরাই জানি টগর, ভাইয়া করিমুদ্দিন, কী ছিল। যদি পারতাম আমি নিজের হাতে সারা কলকাতা শহর ঝাড়ু দিয়ে সাফা করে দিতাম। সব বদবু হাটিয়ে দিতাম। ময়লা একদম সহ্য করতে পারত না টগর। যদি পারতাম কলকাতায় আজ রাতে একটা সূর্য জাগিয়ে দিতাম। যা কাজে পারব না, পারব না। কিন্তু আমার এই ছেঁড়া জামা আর তোমার ওই জখম হাত, আজ ভেলকি দেখাবে চন্দরভাই। কোনো শালার জন্য না, স্রেফ টগরের জন্য তুমি আমি দুই ভাই আজ বেফিক্র বাজিয়ে যাব। তুমি তবলা খুলে বস। আমি রমেনকে বলে আসি।

স্খলিত চরণে চলে গেলেন কুমারনাথ।

এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রাখলেন চন্দ্রজিৎ। বাথরুম ঘুরে এলেন। তারপর বসলেন ফরাসে। জিপবন্ধনী খুলে তবলা বাঁয়া বের করলেন। হাতুড়ি, পাউডারের কৌটো বের করলেন। অস্ফুটস্বরে বললেন, শুধু করিমুদ্দিন ভাইয়ার জন্য নয়। আমার যশোমতীর জন্যও যে আজ আমায় বাজাতে হবে। 'গম তো ভালা ছুপা লিয়া, আঁশু ক্যায়সে ছুপাউ ম্যয়।' বেদনা তো আমি লুকিয়ে রেখেছি, কিন্তু চোখের জল ঢাকি কেমন করে?

তবলা বাঁয়া টেনে আনলেন কোলের কাছে। হাত রাখলেন যন্ত্রের উপর। হাতদুটো আর একটুও কাঁপছিল না।

নয়

আঁখি তার জীবনের সবসেরা প্রোগ্রামটি করলে সেই সন্ধ্যায়। একপাশে

তানপুরা হাতে বসল সুমন, আর এক পাশে পরোজ। মেহবুবা আসেননি কিছুতে। প্রতিনিধি হয়ে এসেছে পরোজ। চিকনের কাজ করা পানজাবি আর পাজামা পরে তাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মন্মথবাবু সস্নেহে বললেন, আদাব খাঁ সাব। পরোজ ফিক করে হেসে ফেলল।

বিভাসও এসেছে। গ্রীণরুমে আঁখিদের সঙ্গে একফাঁকে দেখা করে গ্যালারিতে গিয়ে বসেছে। সামনে আসতে চায় না। বলে: আমার অধিকার নেই।

মঞ্চের একদিকে প্রমাণ সাইজের ছবি একখানা উস্তাদের। ভাইয়া করিমুদ্দিনের। হাসি হাসি মুখ, চোখে স্বপ্ন। প্রিয় মানুষটি আজ কোথায়: শুধু ওই দৃষ্টিটা ফেলে গেছেন। আর রয়েছে ফুলের মালা, ফুলের তবক। পুঞ্জ পুঞ্জ। সব সংগীত প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকেই এসেছে।

দুচোখ তার বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেল। সবজায়গায় আঁখি গেয়েছে। এই মহাসম্মেলন কোনোদিন তাকে ডাকেনি। আর আজ কোন পরিবেশে তাকে গাইতে বসতে হচ্ছে। গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল আঁখির। তারই মধ্যে ঝাপসা দেখল সুবেশ তরুণ একজন কাউকে নিয়ে সুধীশ ঢুকছে হল-এ। একেবারে সামনের সারিতে এনে বসিয়ে দিতে আঁখির বুক কেঁপে গেল। শঙ্খ। শঙ্খ? হাসিমুখে হাত নাড়ল শঙ্খ। মাকে সারপ্রাইজ দিতে বরাবর ভালবাসে সে। সুমন ফিসফিসিয়ে বললে, আণ্টি, শঙ্খদা এসেছে। চোখের জল মুছে আঁখি বললে, হ্যাঁরে মেয়ে, দেব তোকে ওর সঙ্গে পাঠিয়ে।

চোখ বন্ধ করে ধরলে ভীমপলশ্রী। শুক্রবার ঘরে গান বন্ধ থাকত। পীর সাহেব পছন্দ করতেন না। পালিয়ে চলে আসতেন উস্তাদ আঁখির বাড়ি। তাকে দিতেন কঠিন কঠিন জিনিষ। ঘরের কিছু জিনিষ। লে লো তুম ইস চিজ। আগর মত্তকা মিল জায়ে তো পরোজকো শিখা দেনা।' উস্তাদ কি বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু আসন্ন? সত্যনাথের মত সবাই কি তা বুঝতে পারে?

আঁখির গান কানে নিয়ে সুধীশ বাইরে এল। ভীমপলশ্রী ছেলেদের গান। বড় মর্যাদাময় গম্ভীর মানুষের বুকের পাঁজরখসা বেদনা আর্তি ওই গানে। কিন্তু আঁখি আজ কামাল করে দিলে। একজন মেয়ে, তার আউটসাইডার, কেমন ঘরের গান গাইছে দেখ!

তবু. সুধীশকে বাইরে আসতে হল। কারণ কারা যেন একটা বিষাক্ত ফিসফিসানি ছড়িয়ে দিয়েছে যে কুমারনাথ কনফারেনসে আসবেন না। কুমারনাথ দারুণ জনপ্রিয় শিল্পী। তার জন্য অজস্র লোক টিকিট কাটে। শুধু তার জন্যেই। প্রত্যেক শিল্পীরই নিজস্ব ফ্যান গোষ্ঠী থাকে। কুমারনাথের, তুলনায়. আর দুজনের চাইতে বেশিই হবে। গুজব কানে গেলে তারা না অনর্থ বাধায়। অন্যসব প্রোগ্রাম মাটি হয়ে যাবে! রমেনকে এখুনি জানান দরকার।

দেখল রমেন জানে। পোরটিকোতে চায়ের স্টলের কাছে একদল শ্রোতা রমেনকে ঘিরে ধরেছে। উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছে। লোকগুলো গান না শুনে এখানে কেন রসভঙ্গ ঘটাচ্ছে?

রমেন বলছিল, 'কে বলল কপিলজী আসেননি? তিনি এসে হোটেলে উঠেছেন। গাড়ি গেছে তাঁকে আনতে। আপনারা একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরেই ওর বাজনা শুনতে পাবেন। অবশ্য যদি ইচ্ছে করেন, টাকা ফেরৎ নিয়ে যেতে পারেন। ভেবেছেন কি আপনারা?'

সুধীশ তাড়াতাড়ি রমেনকে সরিয়ে নিয়ে গেল। নইলে তার মুখ ছুটবে। অনর্থ হয়ে যাবে।

একতলায় নামতেই একজন ভলানটিয়ার দৌড়ে এসে বলল, 'শিগ্‌গীর আসুন। গ্রীনরুমে গণ্ডগোল হচ্ছে।'

দৌড়ুলো দুজনে। গিয়ে দেখে কুমারনাথ। কখন চলে এসেছে দেখ লোকটা। অথচ তাকে আনতে দু-দুটো গাড়ী গেছে।

টলছিল ভারতবিখ্যাত সরোদিয়া। কিন্তু তার মধ্যেই বলে গেল, সেলাম কলকাতা। হাজারো সেলাম। গোবরা গিয়েছিলাম ভাইয়ার কবরে ফুল দিতে। পার্কসারকাসের মোড়ে গোটাকয় লোক না আমাকে ধরে খুব পেটাল। শালা মদ খেয়ে মাতলামি করছ? তার মধ্যেই হঠাৎ কে আমাকে চিনে ফেলল। ওই গুণ্ডা কসমের ছেলেগুলোই না, খাতির যত্ন করে পেঁৗছে দিয়ে গেল এখানে। বলল, আপনি শিল্পী, আগে বুঝতে পারিনি। মাফ করে দিন। আজব কাণ্ড। শিল্পী বলে সব দোষ মাপ? ভাব একবার!

গান গাইতে গাইতে চোখ খুলে সামনে তাকাল আঁখি। মিঃ রঙ্গনাথন, নিশিবাবু, ওঁদের পিছনের সারিতে ওঁরা কারা? আলো আঁধারির মাঝে এ কি চোখের ভ্রম? না, সত্যি সত্যি আসন জুড়ে বসে আছেন উস্তাদ, মৃদু হাসি মুখে? বসে আছেন চোখ মুদে বাবা? সত্যনাথ? শৈলেন মেসোমশায়, পাহাড়িদা। এ কী কাণ্ড! চোখ বন্ধ করে গানের মধ্যে ডুবে গেল আঁখি।

তারপর, কখন এক সময়, একটি দুটি করে উন্মোচিত হতে লাগল সুরের উৎফুল্ল দলগুলি। ফুটল কমল টলটলাটল রাতের শিশির জল গো। আস্তে আস্তে চোখ মেলে স্পন্দিত হতে লাগল গানের সেই সময় মুছে নেওয়া পাখি। চুণির মত তার দুটি চোখে তন্ময় আলোর ঝিকির মিকির। তার কম্বুগ্রীবায় নরম নরম ঢেউ তুলে পাখিটা চাইলে এদিক ওদিক। তারপর কত অনায়াসে পান্নার মত দুটি ডানায় আলতো ভর দিয়ে উঠে পড়ল, ভেসে পড়ল হাওয়ায়। আধো আলো আধো অন্ধকারে ঢাকা হল-এর পোষমানা হাওয়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। ধাক্কায় ধাক্কায় সরে যেতে লাগল বন্ধ চার দেয়াল, তারপর স্বচ্ছ হয়ে কখন একেবারে মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর ছাত তুলে দিয়ে নেমে এল

তারার তিমির ঢাকা মহাকাশ।

দূরে, দূরে, আরো দূরে পাখিটা উড়ে চলল। আলোর সবুজ তীর যেখানে পৌঁছয় না, সেই নিরলংকারের দিকে। নীচে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সমুদ্র অবিরাম ঢেউ সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বুঝতে চাইছে। উপরে মহাশূন্য, পরিপূর্ণ-তার জন্য তার আবহমান ক্রন্দন নিয়ে। পিছনে পড়ে রইল ভাল-মন্দ, হাসি, চোখের জল, প্রেমবিকার। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত। ঋতু বিন্যাস। দৃষ্টি, বৃষ্টি, সাধনা। চুম্বনের মত ঘন অন্ধকার ডানা থেকে মুছে ফেলে ফেলে পাখিটা ক্রমাগত উড়ে চলে যেতে লাগল।

—